ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

ব্যবহারিক গণিত
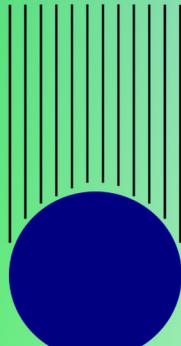
Applied Mathematics

$$(x-h)^2+ (y-k)^2= r^2$$
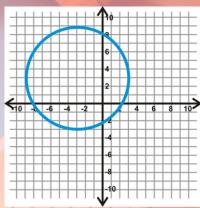
খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া, সিলেট।

ব্যবহারিক গণিত

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী

বিশেষ ইন্টারনেট সংস্করণ

ISBN: 998-1254-08-1

খানক্বায়ে আমীনিয়া-আসগরিয়া প্রকাশনী
সুবিদবাজার পয়েন্ট, সিলেট।

সূচিপত্র

লন্ডনে কলেজে অধ্যয়নরত আমার আদুরে ছোট ছেলে

মেহরাজ ইবনে বারী শাহরাজ-কে

তার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক এই কামনায়।

ভূমিকা

বেশ কিছুদিন পূর্বে 'সবার জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি' শিরোনামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলাম। ঢাকার 'হলি মিডিয়া' প্রকাশনী বইটি গত ২১ ফেব্রুয়ারী ২০০৯ প্রকাশও করেছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে উপেক্ষা করে এ যুগে একটি জাতি বিশ্ব-দরবারে কস্মিনকালেও শির উত্তোলন করে দাঁড়াতে পারবে না। উপরোক্ত গ্রন্থটি রচনার মূল উদ্দেশ্য ছিলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে সমাজে 'জনপ্রিয়' করার ক্ষুদ্র প্রয়াস। প্রকাশ হওয়ার পর বইটি পাঠকসমাজে সমাদৃত হয়েছে। এটা আমার জন্য সুখের ব্যাপার। আর এ থেকে বিরাট আরেক ফায়দা পেয়েছি তাহলো বিজ্ঞানের উপর আরো গ্রন্থ রচনার উৎসাহ-উদ্দীপনা ও প্রেরণা। সুতরাং অচিরেই আরেকটি গ্রন্থ রচনায় হাত দিলাম- আর এই সেই গ্রন্থ।

গণিতকে বিজ্ঞানের 'মা' বলা হয়। গণিতকে না জেনে না চিনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উপর সত্যিকার জ্ঞানার্জন সম্ভব নয়। সুতরাং এই গ্রন্থে ছাত্র-ছাত্রী ও সাধারণ পাঠকদের উদ্দেশ্যে খুব সহজ-সরল ভাষায় ব্যবহারিক গণিতের উপর মৌলিক তথ্যাদি নিয়ে বর্ণনা এসেছে। আমি আশা করছি এসএসসি পর্যায় পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীরা এ থেকে উপকৃত হবেন। এসাথে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে আরো জানার আগ্রহশীল সকল পর্যায়ের পাঠকও কিছুটা ফায়দা পাবেন বলে আমার বিশ্বাস।

সাধারণ পাঠ্য পুস্তকের মতো বইটিতে কোনো অনুশীলনী যুক্ত করি নি। তবে শিক্ষার্থীদের সুবিধার্থে কিছু দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছি। অবশ্য শিক্ষকরা বিভিন্ন সমীকরণের ব্যবহারের উপর মডেল প্রশ্নাবলী তৈরী করে শিক্ষার্থীদেরকে অনুশীলন করাতে পারেন।

সবশেষে বইটি প্রকাশনার সঙ্গে জড়িত সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। আর ভুল-ত্রুটির ঊর্ধ্বে ওঠা কখনো কারো পক্ষে সম্ভব নয়। তবে চেষ্টা করেছি যাতে তা কম হয়- এরপরও কারো চোখে ভুল ধরা পড়লে জানিয়ে বাধিত করবেন। আগামী সংস্করণে তা শোধরে দেওয়া হবে ইনশাআল্লাহ।

ইঞ্জিনিয়ার আজিজুল বারী
আলী সেন্টার, সুবিদ বাজার, সিলেট।
১লা জুন ২০০৯ ঈসায়ী।

প্রথম অধ্যায়

ব্যবহারিক গণিত

গণিতের এক শাখার নাম হিসাব-বিজ্ঞান। হিসাব শব্দ আরবি 'হাসিব' শব্দ থেকে এসেছে। আমরা সর্বদাই হিসাব করে যাচ্ছি। যোগ-বিয়োগ-ভাগ-পূরণ ছাড়াও অঙ্ক দ্বারা আরো অনেক বস্তু ও বিষয়ের সঠিক হিসাব জানতে হয়। বিজ্ঞানের বহু থিওরী, উপপাদ্য, সংজ্ঞা ইত্যাদিও অঙ্ক বা গণিতের উপর নির্ভরশীল। অঙ্ক ছাড়া পুরো বিজ্ঞানই অচল- তাই এই বিষয়কে ইংরেজিতে **'Mother of science'** [বিজ্ঞানের মা] বলা হয়ে থাকে। অঙ্কশাস্ত্র দুই প্রকার: ১. বিশুদ্ধ গণিত (**Pure Mathematics**) এবং ২. ব্যবহারিক গণিত (**Applied Mathematics**)। এই গ্রন্থে আমরা দ্বিতীয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনা করবো।

১.১ ব্যবহারিক গণিত (Applied Mathematics)

ব্যবহারিক গণিত ও বিশুদ্ধ গণিতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় খুব সহজ নয়। উভয়টিই বিশেষ প্রণালীবদ্ধ নিয়ম-পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত। তাহলে আমরা কিভাবে ব্যবহারিক গণিতের সংজ্ঞা প্রদান করবো? আমরা বলতে পারি: **বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা যেমন পদার্থবিদ্যা (Physics), রসায়নশাস্ত্র (Chemistry), জীববিদ্যা (Biology), চিকিৎসাবিদ্যা (Medicine), প্রকৌশলবিদ্যা (Engineering) ও প্রযুক্তিবিদ্যা (Technology) ইত্যাদি শাস্ত্রে গাণিতিক সমস্যা সমাধানে বিশুদ্ধ গণিতের ব্যবহারের নামই হলো ব্যবহারিক গণিত।**

উপরে উল্লেখিত বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের ক্ষেত্রে গণিতের ব্যবহারের উপর আরো আলোচনার পূর্বে আমরা মাপজোখ ও মাপার যন্ত্রপাতি সম্পর্কে এই প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিত জেনে নেবো। এর ফলে পরবর্তী অধ্যায়সমূহে বর্ণিত ব্যবহারিক গণিতের জটিল বিষয়সমূহ অনুধাবন অনেকটা সহজ হবে।

১.২ মাপজোখ (Measurement)

আমরা প্রথমে আধুনিক একখানা বাড়ির প্ল্যান বা নক্সা তৈরী করবো। এই ডিজাইনটি অবশ্য পেন্সিল দ্বারা কাগজে বসানোর পূর্বে একজন আর্কিটেক্ট বা ভবন ডিজাইনারের মস্তিষ্কে তা চিত্রিত হতে হবে। তার এই কল্পিত বাড়িটি বাস্তবতার আলো দেখার

প্রাথমিক কাজই হলো কাগজে অঙ্কিত নক্সা। কিন্তু এই নক্সা আঁকা অঙ্ক ছাড়া আদৌ সম্ভবই নয়। এবার আসুন আমরা নক্সা আঁকা শুরু করি।

১.৩ স্কেল ড্রইং (Scale Drawing)

আমরা জানি ইমারত বা বিল্ডিংয়ের আয়তন কাগজে অঙ্কিত নক্সার তুলনায় অনেকগুণ বড়। আমাদেরকে সঠিকভাবে চিত্রাঙ্কন করতে যেয়ে তাই কোনো বিশেষ পদ্ধতির অনুসরণ করতে হবে। এই পদ্ধতির নাম স্কেল ড্রইং (**Scale Drawing**)। এর অর্থ হলো, বিল্ডিংয়ের মাপজোখ কম মাত্রা দ্বারা বেশি বুঝানো। যেমন আমরা যদি বলি: ৫ মিলিমিটার সমান ১ ফুট তাহলে ৩০ ফুট দৈর্ঘ্য ও ২৫ ফুট প্রস্থ একটি ইমারতকে একদিকে ১৫০ মি.মি. (সমান ৩০ ফুট) আর অপরদিকে ১২৫ মি.মি. (সমান ২৫ ফুট) একটি ব্লকে দেখাতে সক্ষম হবো। সুতরাং ছোট্ট সচরাচর ব্যবহৃত A4 (২৯৭ মি.মি. X ২১০ মি.মি.) কাগজে অনায়াসে আমরা বিল্ডিংয়ের পুরো মেঝের নক্সা তৈরী করতে সক্ষম হবো। এভাবে নক্সা তৈরী করতে যেয়ে আর্কিটেক্ট বা ইঞ্জিনিয়ার সাহেবকে প্রতিটি ক্ষেত্রে মাপজোখের সময় এই স্কেলের হিসাব করতে হবে। এই হিসাবের নাম হলো স্কেল বা অনুপাত। আমাদের এই উপমায় স্কেল হলো: ৫ মি.মি. = ১ ফুট। অবশ্য উভয় মাপ যদি মি.মি. কিংবা ফুট হয় তাহলে ভালো। কিন্তু উক্তভাবে করলেও কাজ সারবে। এবার নিচের চিত্রের প্রতি লক্ষ করুন। আমরা এখানে একটি বিল্ডিংয়ের 'গ্রাউন্ড ফ্লোর প্ল্যান' (**Ground Floor Plan**) নক্সার ক'টি প্রাথমিক রেখা অঙ্কন করেছি। ইতোমধ্যে বর্ণিত স্কেল মুতাবিক এই নক্সা আঁকা হয়েছে।
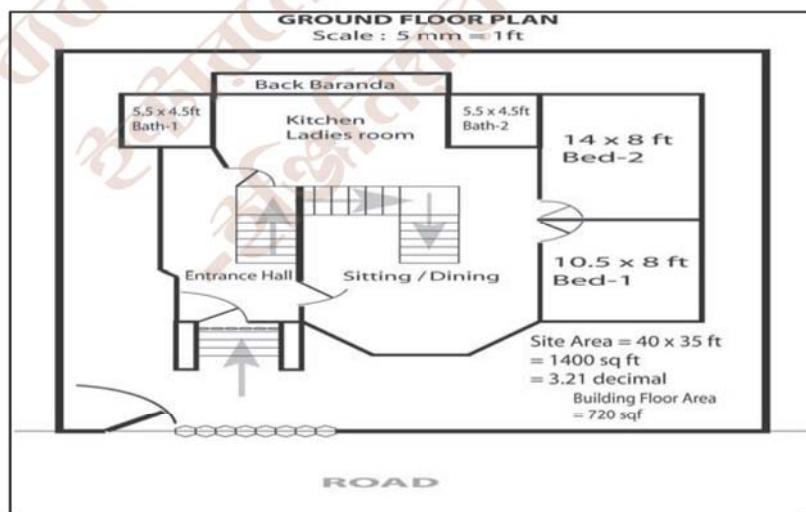
উপরের নক্সাটির প্রতিটি লাইন বা রেখা ঐ স্কেল মুতাবিক হওয়ায় পুরো ফ্লোর প্ল্যানের সঠিক একটি স্কেল ডাউন (**Scale Down**) নমুনা আমাদের চোখে চিত্রিত হয়েছে। যেহেতু আমরা বলেছি ৫ মি.মি = ১ ফুট তাই এই হিসাবে প্রতিটি লাইনের দৈর্ঘ্য অঙ্কন করতে যেয়ে আমাদেরকে ফুটের সংখ্যার পরিমাণ ৫ দ্বারা পূরণ করে বের করতে হয়েছে। যেমন সিঁড়ির প্রতিটি স্টেপ বা ধাপের মাপ হলো ৩ ফুট (দৈর্ঘ্য) X ১০ ইঞ্চি (চওড়া) X ৬ ইঞ্চি (উচ্চতা)। দৈর্ঘ্য হবে ৩×৫ = ১৫ মি.মি.। চওড়া হবে ১০ × ৫/১২ = ৫০/১২ = ৪.৫ মি.মি.। লক্ষ করুণ কিভাবে ১ ইঞ্চির পরিমাণ বের করা হয়েছে। যেহেতু আমরা বলেছি ১২ ইঞ্চি (মানে ১ ফুট) সমান ৫ মি.মি. তাই ১ ইঞ্চি হবে ৫/১২ মি.মি.। সবশেষে সিঁড়ির উচ্চতা হবে ৫ × ৬/১২ = ২.৫ মি.মি.। শেষোক্ত হিসাবটি আমরা অন্যভাবেও করতে পারি, যেমন: ৫/১২ (১ ইঞ্চির পরিমাণ) × ৬ = ৩০/১২ = ২.৫ মি.মি.।

উপরোক্ত উপায়ে ইঞ্জিনিয়াররা আজকাল কম্পিউটারের মাধ্যমে বিভিন্ন যন্ত্রের স্কেল ডাউন বা স্কেল আপ (**Scale Up**) চিত্র, ম্যাপ, প্ল্যান, ছবি, তিন-বিস্তৃতিসম্পন্ন মডেল (**3-D Models**) ইত্যাদি অঙ্কন করে থাকেন। আগের দিনে বড় বড় কাগজে বা ট্রেসিং পেপারে অত্যন্ত সতর্কতা ও কষ্ট সহ্য করে রেখা চিত্রাঙ্কনের (**Line Drawings**) মাধ্যমে নক্সা তৈরী করতে হতো। আজকাল এভাবে করার প্রয়োজন আর তেমনটি নেই। কম্পিউটার এইডেড ডিজাইন (**Computer Aided Design - সংক্ষেপে CAD**) সফটওয়্যার (**Software**) দ্বারা এ যুগে প্রায় সব ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং (**Engineering**) ও আর্কিটেকচারেল (**Architectural**) চিত্রাঙ্কন করা হচ্ছে। শুধু তাই নয় ডিজাইন ও যাবতীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা কম্পিউটারের মাধ্যমেই করা হয়ে থাকে। যন্ত্রাদির পূর্ণ ডিজাইন কম্পিউটারের মাধ্যমে সম্পন্ন শেষে তৈরীর জন্য উৎপাদন প্রক্রিয়ায় প্রেরণ করা হয়। সুতরাং আধুনিক যুগে আমরা কম্পিউটারের সাহায্যে দ্রুত যে কোনো ডিজাইন প্রক্রিয়া সেরে নিতে পারি। তবে অবশ্যই কম্পিউটার টেকনোলজি (**Technology**) বা প্রযুক্তির উপর দক্ষতা ছাড়া তা আঞ্জাম দেওয়া সম্ভব নয়। আমরা সঠিক স্থানে কম্পিউটার বিজ্ঞানের উপর মৌলিক আলোচনা করবো। উল্লেখ্য উপরের চিত্রটি (চিত্র ১.১) সম্পূর্ণটাই কম্পিউটারের একটি জনপ্রিয় সফটওয়ার দ্বারা অঙ্কন করা হয়েছে।

মাপজোখ ছাড়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কোনো বিষয়ের উপরই সঠিক পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ আদৌ সম্ভব নয়। সুতরাং এ সম্পর্কে আমাদেরকে আরো বেশি জানতে হবে। আসুন তাহলে আরো এক দু'টো পদ্ধতি জেনে নিই।

১.৪ বৈজ্ঞানিক মাপজোখ (Scientific Measurement)

আমরা একটু পরই বৈজ্ঞানিক মাপজোখের কিছু আধুনিক উপায়-উপকরণ ও পদ্ধতির উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো। তার আগে আমাদেরকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মাপজোখের ইউনিটস (**Units**) সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে হবে। এই সর্বজনস্বীকৃত ইউনিটের নাম হলো এসআই ইউনিটস (**SI Units**)।

১.৫ এসআই ইউনিটস (SI Units)

এই ইউনিটের পুরো নাম হলো (**International System of Units**)। ফরাসী ভাষায় নামটি হচ্ছে: **Le Système International d'Unités**। ওজন ও মাপজোখের উপর একটি সাধারণ কনফারেন্স ১৯৬০ সালে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে অনুষ্ঠিত হয়। আন্তর্জাতিক এই বৈঠকেই এমকেএস (**meter-kilogram-second**) এর উপর ভিত্তি করে এসআই সিস্টেম সর্বত্র ব্যবহারের জন্য গৃহীত হয়। শিক্ষার্থীরা এ পর্যায়ে নিম্নের টেবিলগুলোতে (টেবিল ১.১ .... ১.৬) দেওয়া সবক'টি পরিমাপ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল না থাকলেও কোনো অসুবিধা নেই। আমরা গুরুত্বপূর্ণ ক'টি মাত্র নিয়ে এই গ্রন্থে বিশদভাবে আলোচনা করবো। বাস্তবে পূর্ণতার লক্ষ্যে প্রায় সবগুলো পরিমাপ ও একক টেবিলগুলোতে দেখানো হয়েছে।

১.৬ ওজন ও মাপজোখে ব্যবহৃত এসআই সিস্টেম

এসআই সিস্টেমের মৌলিক ইউনিটগুলোর নাম ও মাপের টেবিল নিম্নরূপ:

টেবিল ১.১

পরিমাপ (Quantity)	এসআই মৌলিক ইউনিটের (এককের) নাম	সঙ্কেত
দৈর্ঘ্য (Length)	মিটার (Meter, Metre)	মি (m)
ওজন (Mass)	কিলোগ্রাম (kilogram)	কেজি (kg)
সময় (Time)	সেকেন্ড (second)	সে (s)
বৈদ্যুতিক কারেন্ট (Electric current)	আম্পিয়ার (ampere)	এ (a)
থার্মোডাইনামিক তাপমাত্রা (Thermodynamic temperature)	কেলভিন (kelvin)	কে (k)

বস্তুর পরিমাণ (Amount of substance)	মৌল্ (mole)	মোল (mol)
ঔজ্জ্বল্যতার প্রাবল্য (Luminous intensity)	কেন্ডেলা (candela)	সিডি (cd)

এসআই সিস্টেমের সম্পূরক দু'টি ইউনিটের নাম ও মাপের টেবিল নিম্নরূপ:

টেবিল ১.২

পরিমাপ (Quantity)	**এসআই সম্পূরক ইউনিটের নাম**	**সঙ্কেত**
সমতল কোণ (Plane angle)	রেডিয়ান (radian)	রেড (rad)
ঘন কোণ (Solid angle)	স্টেরেডিয়ান (steradian)	এসআর (sr)

উপরের টেবিলদ্বয়ে বর্ণিত ইউনিটগুলো ছাড়াও আরও বহু ধরনের ইউনিটের মাপজোখ করতে হয়। আমরা এবার নিম্নের টেবিলে ওসব মাপজোখ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরছি।

টেবিল ১.৩

Quantity (**পরিমাপ**)	SI Unit (**এসআই একক**)	Symbol (**সঙ্কেত**)
absorbed radiation dose (শোষণকৃত তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা)	gray (গ্রে)	Gy (জিওয়াই)
amount of substance (বস্তুর পরিমাণ)	mole* (মৌল্)	mol (মোল)
electric capacitance (বিদ্যুৎ ধারণশক্তি)	farad (ফারাদ)	F (এফ)
electric charge (বৈদ্যুতিক চার্জ)	coulomb (কুলম্ব)	C (সি)
electric conductance (বিদ্যুৎ পরিবহন মাত্রা)	siemens (সিমেন্স)	S (এস)
electric current (বৈদ্যুতিক কারেন্ট)	ampere* (আম্পিয়ার)	A (এ)
energy or work (এনার্জি বা কর্ম)	joules (জুলস্)	J (জে)
force (বল)	newton (নিউটন)	N (এন)
frequency (পৌনঃপুন্য)	hertz (হার্টজ)	Hz (এইচজেড)
illuminance (আলোকশক্তি)	lux (লাক্স)	lx (এলএক্স)
inductance (অপবাহন শক্তি)	henry (হেনরি)	H (এইচ)

length (দৈর্ঘ্য)	meter* (মিটার)	m (মি)
luminous flux (ঔজ্জ্বল্যতা প্রবাহ মাত্রা)	lumen (লুমেন)	lm (এলএম)
luminous intensity (ঔজ্জ্বল্যতার প্রাবল্য)	candela* কেন্ডেলা	cd সিডি
magnetic flux (চুম্বকীয় প্রবাহ মাত্রা)	weber (ওয়েভার)	Wb (ডব্লিউবি)
magnetic flux density (চুম্বকীয় প্রবাহ মাত্রার ঘনত্ব)	telsa (টেলাসা)	T (টি)
mass (ওজন)	kilogram* (কিলোগ্রাম)	kg (কেজি)
plane angle (সমতল কোণ)	radian* (রেডিয়ান)	rad (রেড)
potential difference (বিভব পার্থক্য)	volt (ভল্ট)	V (ভি)
power (ক্ষমতা)	watt (ওয়াট)	W (ডব্লিউ)
pressure (চাপ)	pascal (পাসকেল)	Pa (পিএ)
radiation dose equivalent (তেজস্ক্রিয়তার মাত্রার সমমান)	sievert (সিভার্ট)	Sv (এসভি)
radiation exposure (তেজস্ক্রিয়তা উন্মুক্ততা)	roentgen (রেন্টগেন)	R (আর)
radioactivity (তেজস্ক্রিয়তা)	becquerel (বেকরেল)	Bq (বিকিউ)
resistance (বৈদ্যুতিক রোধ পরিমাপ)	ohm (ওহ্ম)	Ω (অমেগা)
solid angle (ঘন কোণ)	steradian* (স্টিরেডিয়ান)	sr (এসআর)
sound intensity (শব্দ প্রাবল্য)	decibel (ডেসিবেল)	dB (ডিবি)
temperature (তাপমাত্রা)	°Celsius (°সেলসিয়াস)	°C (°সি)
thermodynamic temperature (থার্মোডাইনামিক তাপমাত্রা)	kelvin* (কেলভিন)	K (কে)
time (সময়)	second* (সেকেন্ড)	s (সে)

* - *SI base unit* (*টেবিল ১.১ ও ১.২-এ দেওয়া এসআই মৌলিক ইউনিট*)।

উপরের (টেবিল ১.৩) টেবিলটিতে অন্যান্য এসআই ইউনিটসহ পুরো বৈজ্ঞানিক পরিমাপের বাংলা অনুবাদসহ ইংরেজি নাম দেওয়া হয়েছে। সাধারণত বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদেরকে ইংরেজি নামগুলোই শিখে নিতে হয়। সুতরাং টেবিলে উল্লেখিত বাংলা নামগুলো শুধুমাত্র বুঝার ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদানই উদ্দেশ্য।

১.৭ উদ্ভূত এসআই ইউনিটস (Derived SI Units)

উপরোক্ত টেবিলত্রয়ে দেওয়া এসআই ইউনিটের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক মাপজোখের কারণে বেশ কিছু উইনিট বা একক উদ্ভূত হয়েছে। আমরা এবার ওসব ইউনিটের একটি টেবিল নিচে সংযোজন করছি।

টেবিল ১.৪

Quantity (পরিমাপ)	Name of derived SI Unit (উদ্ভূত এসআই ইউনিটের নাম)	Symbol (সঙ্কেত)
Area (ক্ষেত্রফল)	square meter (স্কোয়ার মিটার)	m^2 (মিটার স্কোয়ায়)
Volume (ঘনফল)	cubic meter (কিউবিক মিটার)	m^3 (মিটার কিউব)
Velocity (গতির হার)	meter per second (মিটার প্রতি সেকেন্ড)	m/s (মি/সে)
Acceleration (ত্বরণ হার)	meter per second squared (মিটার প্রতি সেকেন্ড স্কোয়ার্ড)	m/s^2 (মি/সে^{২})
Density (ঘনাঙ্ক)	kilogram per cubic meter (কিলোগ্রাম প্রতি কিউবিক মিটার)	kg/m^3 (কেজি/মি^{৩})
Density of current (কারেন্টের ঘনাঙ্ক)	ampere per suare meter (আম্পিয়ার প্রতি স্কোয়ার মিটার)	A/m^2 (আম্প/মি^{২})
Magnetic field strength (চুম্বকীয় ফিল্ড শক্তি)	ampere per meter (আম্পিয়ার প্রতি মিটার)	A/m (আম্প/মিটার)
Specific volume (আপেক্ষিক ঘনফল)	cubic meter per kilogram (কিউবিক মিটার প্রতি কিলোগ্রাম)	m^3/kg (মি^{৩}/কেজি)
Luminance (ঔজ্জ্বল্যতার মান)	candela per square meter (কেন্ডেলা প্রতি স্কোয়ার মিটার)	cd/m^2 (সিডি/মি^{২})
Wavelength (তরঙ্গদৈর্ঘ্য)	meter (মিটার)	λ (লামদা)
Frequency (তরঙ্গসংখ্যা)	Hertz (Hz) (হার্টজ)	1/s (সংখ্যা/সেকেন্ড)
Force (বল)	Newton (N) (নিউটন)	$kg.m/s^2$

		(কিলোগ্রাম.মি/সে^{২})
Pressure, Stress (চাপ, প্রসারণ)	Pascal (Pa) (পাসক্যাল)	N/m^2 (নিউটন/মি^{২})
Energy, Work, Heat Quantity (এনার্জি, কর্ম, তাপমাত্রা)	Joule (J) (জুল)	N.m (নিউটন.মি)
Power (ক্ষমতা)	Watt (W)	J/s (জুল/সে)
Quantity of Electricity (বিদ্যুতের মাত্রা)	Coulomb (C) (কুলম্ব)	A.s (আম্প.সে)
Electric Potential (বিদ্যুৎ আপেক্ষিক মাপ)	Volt (V) (ভল্ট)	W/A (ওয়াট/আম্প)
Capacitance (রক্ষণক্ষমতা)	Farad (F) (ফারাদ)	C/V (কুলম্ব/ভল্ট)
Electric Resistance (বিদ্যুৎ রোধক্ষমতা)	Ohm (Ω) (ওহ্‌ম)	V/A (ভল্ট/আম্প)
Electric Conductance (বিদ্যুৎ প্রবাহক্ষমতা)	Siemens (S) (সিমেন্স)	A/V (আম্প/ভল্ট)
Magnetic Flux (চুম্বক প্রবাহ)	Weber (Wb) (ওয়েবার)	V.s (ভল্ট.সে)
Magnetic Flux Density (চুম্বক প্রবাহ ঘনত্ব)	Telsa (T) (টেসলা)	Wb/m^2 (ওয়েবার/মি^{২})
Inductance (অপবাহ)	Henry (H) (হেনরি)	Wb/A (ওয়েবার/আম্প)
Luminous Flux (ঔজ্জ্বল্য প্রবাহ)	Lumen (lm) (লিউমেন)	cd.sr (কেন্ডেলা.স্টেরাডিয়ান)
Illuminance (ঔজ্জ্বল্যতা)	Lux (lx) (লাক্স)	lm/m^2 (লিউমেন/মি^{২})
Activity (or radionuclides) (তরঙ্গক্রিয়া)	Bcquerel (Bq) (বেকারেল)	1/s (সংখ্যা/সে)
Absorbed Dose (শোষিত মাত্রা)	Gray (Gy) (গ্রে)	J/kg (জুল/কেজি)

১.৮ মেট্রিক সিস্টেম (Metric System)

মাপজোখে ব্যবহৃত অপর একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সিস্টেম হলো মেট্রিক সিস্টেম (Metric System)। এটা মূলত দৈর্ঘ্য মাপার ইউনিট মিটারের (m) উপর নির্ভরশীল একটি ফিজিক্যাল মাপজোখের (বা বাস্তব মাপজোখের) দশমিক সিস্টেম (Decimal system)।

মেট্রিক সিস্টেম অত্যন্ত সহজবোধ্য এবং ব্যবহারোপযোগী হওয়ায় পৃথিবীর সর্বত্র এটা জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছে। নিম্নের দু'টি টেবিলে আমরা প্রমাণস্বরূপ মেট্রিক সিস্টেমের মৌলিক ক'টি ইউনিটের উপসর্গের নাম উদাহরণসহ তুলে ধরেছি।

টেবিল ১.৫

উপসর্গের নাম (Frefix Name)	অর্থ (Meaning)	উদাহরণ (Example)
ডেকা (Deca-)	১০ গুণ	১০ ডেকামিটার (Decameter) = ১০×১০ = ১০০মি
হেক্টো (Hecto-)	১০০ গুণ	১ হেক্টোমিটার (Hectometer) = ১০০×১ = ১০০মি
কিলো (Kilo-)	১০০০ গুণ	২ কিলোমিটার (Kilometer) = ১০০০×২ = ২০০০মি
মেগা (Mega-)	১০০০০০০ (১ মিলিয়ন) গুণ	২ মেগাওয়াট্স (Megawatts) = ২×১০০০০০০ = ২০০০০০০ (২ মিলিয়ন) ওয়াট্স।
জিগা (Giga-)	১০০০০০০০০০ (১ বিলিয়ন) গুণ	৩ জিগাবাইট্স (Gigabytes) = ৩×১০০০০০০০০০ = ৩০০০০০০০০০ (৩ বিলিয়ন) বাইট্স (কম্পিউটারের মেমরি)।
টেরা (Tera-)	১০০০ বিলিয়ন (১ ট্রিলিয়ন) গুণ	৬ টেরাওয়াট্স (Terawatts) = ৬×১০০০ = ৬০০০ বিলিয়ন

টেবিল ১.৬

উপসর্গের নাম (Frefix Name)	অর্থ (Meaning)	উদাহরণ (Example)
ডেসি (Deci-)	১/১০ অংশ	১০ ডেসিমিটার (Decimeter) = ১০×১/১০ = ১মি
সেন্টি (Centi-)	১/১০০ অংশ	১০০ সেন্টিমিটার (Centimeter) = ১০০×১/১০০ = ১মি
মিলি (Milli-)	১/১০০০ অংশ	১০০০ মিলিমিটার (Millimeter) = ১০০০×১/১০০০ = ১মি
মাইক্র (Micro-)	১/১০০০০০০ (১/১ মিলিয়ন) অংশ	১০০০০০০ মাইক্রমিটার (Micrometer) = ১০০০০০০×১/১০০০০০০ = ১মি
নানো (Nano-)	১/১০০০০০০০০০ (১/১ বিলিয়ন) অংশ	১০০০০০০০০০ নানোমিটার (Nanometer) = ১×১/১০০০০০০০০০ = ১মি

পিকো (Pico-)	১/১০০০ বিলিয়ন (১/১ ট্রিলিয়ন) অংশ	১০০০ বিলিয়ন পিকোমিটার (Picometer) = ১০০০×১/১০০০ = ১মি

১.৯ মেট্রিক সিস্টেমে ইউনিট রদবদল

উপরের টেবিল থেকে স্পষ্ট, মেট্রিক সিস্টেম ব্যবহারে আমরা অতি সহজেই এক ইউনিট থেকে অপরটিতে রদবদল করতে পারি। ক'টি উদাহরণ দ্বারা এটা পরিষ্কার হবে:

ক. ২৩৪৫.০ মিলিমিটার = ২৩৪.৫ (কারণ ১০ মিমি = ১ সেমি) সেন্টিমিটার = ২.৩৪৫ (কারণ ১০০ সেমি = ১ মি) মিটার। লক্ষ করুন কিভাবে দশমিক বিন্দুকে বায়ের দিকে ক্রমান্বয়ে সরিয়ে বিভিন্ন ইউনিটে রূপান্ত করা হয়েছে।

খ. ১২৫৬১.০ কিলোমিটার = ১২৫৬১০০০.০ (কারণ ১ কিমি = ১০০০ মি) মিটার = ১২৫৬১০০০০০.০ (কারণ ১ মি = ১০০ সেমি) সেন্টিমিটার = ১২৫৬১০০০০০০.০ (কারণ ১ সেমি = ১০ মিমি) মিলিমিটার। লক্ষ করুন কিভাবে দশমিক বিন্দুকে ডানের দিকে ক্রমান্বয়ে সরিয়ে বিভিন্ন ইউনিটে রূপান্তর করা হয়েছে।

উপরে (ক ও খ-তে) দেখানো পদ্ধতির মতো পুরাতন (ইম্পিরিয়েল) সিস্টেমে রূপান্তর তেমন সহজ নয়। ১২৪৫৬ ইঞ্চিকে ফিট, রডস্, ফার্লংস্, মাইলস্ ইত্যাদিতে রূপান্তর করার চেষ্টা করলেই বিষয়টি ধরা পড়বে। এরপরও এটা জেনে রাখা ভালো: **১ মিটার = ৩৯.৩৭ ইঞ্চি; ১ মাইল = ১.৬ কিলোমিটার**। এই গ্রন্থে আমরা শুধুমাত্র মেট্রিক ও এসআই সিস্টেম ব্যবহার করবো। সুতরাং এখন থেকে মাইল, ইঞ্চি ইত্যাদি আর উল্লেখ হবে না।

১.১০ দূরত্ব মাপার ক'টি বিশেষ একক

দূরত্ব বা দৈর্ঘ্য মাপতে যেয়ে আমরা কিলোমিটার, মিটার, সেন্টিমিটার, মিলিমিটার ইত্যাদি মেট্রিক ইউনিট ব্যবহার করি। এসব ইউনিটের মধ্যে পার্থক্য কতটুকু তা-ও আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি। বিজ্ঞানের সর্বক্ষেত্রে এ ইউনিটগুলো ব্যবহার সম্ভব নয়। বিশেষকরে খুব বেশি দূরত্ব মাপতে যেয়ে এই ইউনিট ব্যবহার অনেকটা ব্যবহারানুপযোগী হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং আমাদেরকে ওসব ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু বড়

মাপের ইউনিট নিয়ে কাজ করতে হবে। দূরত্ব মাপার এরূপ ক'টি বিশেষ ইউনিটের ব্যাখ্যা এখন আমরা তুলে ধরবো।

ক. জ্যোতিঃশাস্ত্রীয় ইউনিট (Astronomical Unit [AU])

আমাদের সৌরজগতের অভ্যন্তরস্থ গ্রহ-উপগ্রহ ইত্যাদির কক্ষপথ (orbit) এবং বঙ্কিমপথ (trajectory) পরিমাপের জন্য এই ইউনিট ব্যবহৃত হয়। **এইউ** (AU) = **সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে গড় দূরত্ব**। এ সংখ্যাটির মাত্রা হলো প্রায় **১৪,৯৬,০০,০০০** কিমি।

খ. পার্সেক (Parsec)

তারার দূরত্ব মাপতে যেয়ে এই ইউনিটটি ব্যবহৃত হয়। অবশ্য নিম্নে বর্ণিত আলোক-বৎসর ইউনিটও এরূপ বিরাট দূরত্ব মাপার জন্য কাজে লাগানো হয়। **১ পার্সেক = ৩০.৮৬ ট্রিলিয়ন কিমি = ৩.২৬ আলোক বৎসর = ২,০৬,২৬৫ এইউ।**

গ. আলোক-বৎসর (Light-Year)

বিরাট দূরত্ব মাপার জন্য এই ইউনিট ব্যবহৃত হয়। জ্যোতির্বিজ্ঞানে তারা, তারা ক্লাস্টার, গ্যালাক্সি ইত্যাদির দূরত্ব মাপতে যেয়ে আলোক-বৎসরের ব্যবহারই বেশি হয়ে থাকে। এক আলোক-বৎসর অর্থ হলো পূর্ণ একটি সৌরবৎসরে আলোকরশ্মি যেটুকু দূরত্বে ভ্রমণ করে, সে-ই পরিমাণ দূরত্ব। **আলোকের গতি ৩,০০,০০০ কিমি প্রতি সেকেন্ড**। এই হিসাবে **১ আলোক-বৎসর = ৯,৪৬,১০০,০০০০,০০০** কিমি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মাপজোখের যন্ত্রপাতি

বিজ্ঞান মূলত শুধুমাত্র যুক্তির মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত নয়। এর পেছনে সর্বদাই বাস্তব পরীক্ষণ-নিরীক্ষণ জড়িত থাকে। বিজ্ঞানীরা সাইন্টিফিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেন পরীক্ষাগারে। প্রায়শঃই যন্ত্রের মাধ্যমে মাপজোখের ফলাফলের উপর নির্ভর করে কোনো বিশেষ গবেষণার সঠিক সিদ্ধান্ত নিরূপণ। আগের অধ্যায়ে আমরা বৈজ্ঞানিক বিভিন্ন মাপ ইউনিটের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। এই অধ্যায়ে আমরা ওসব ইউনিট মাপতে যেয়ে যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহৃত হয় ওগুলোর উপর সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

২.১ আমিটার (Ammeter) ও ভল্টমিটার (Voltmeter)

যথাক্রমে ইলেকট্রিক কারেন্ট এবং ইলেকট্রিক ভলটেজের পরিমাণ মাপার জন্য আমিটার ও ভল্টমিটার ব্যবহৃত হয়। আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি ইলেকট্রিক কারেন্টের ইউনিট হলো আম্পিয়ার (আম্পস্) এবং আপেক্ষিক পার্থক্য নির্ণয়ের ইউনিটের নাম ভল্ট। আমিটার ও ভল্টমিটার সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান তখনই সম্ভব যখন আমরা বুঝতে সক্ষম হবো এই যন্ত্রদ্বয় বাস্তবে কি জিনিস পরিমাপ করে। সুতরাং আমরা এবার ইলেকট্রিক কারেন্ট, পটেনশিয়্যাল (আপেক্ষিক) পার্থক্য ও বৈদ্যুদিক রোধ (Electrical Resistance) বলতে কি বুঝায় সে ব্যাপারে একে একে আলোচনা করবো।

ক. ইলেকট্রিক কারেন্ট (Electric current)

একটি বৈদ্যুতিক তারের ভেতর যেসব ইলেকট্রন চলে ওগুলোই হলো ইলেকট্রিক কারেন্ট। এসব চলন্ত ইলেকট্রনকে বলে 'চার্জড' (Charged) ইলেকট্রন। তার বা কন্ডাকটারের (Conductor) মাধ্যমে চার্জড ইলেকট্রন দু'টি পদ্ধতিতে চলন্ত হতে পারে: ১. সরাসরি একদিকে চলন্ত (Direct current - DC) এবং ২. সামনে ও পেছনে এই উভয়দিকে চলন্ত (Alternating current - AC)। কোনোটা ডিসি আর কোনোটি এসি কারেন্ট হবে তা নির্ভর করে কোন্ ধরনের জেনারেটর (Generator) দ্বারা এই কারেন্ট তৈরি করা হয়েছে। এবার শিক্ষার্থীদের বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে, জেনারেটরও ডিসি কিংবা এসি হতে পারে।

কন্ডাকটার বা তারের কোনো একটি পয়েন্ট দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে কি পরিমাণ চার্জড ইলেকট্রন অতিক্রম করে যাচ্ছে সেই হিসাবকেই আম্পিয়ার ইউনিট দ্বারা মাপা হয়। **১ আম্পিয়ার অর্থ প্রতি সেকেন্ডে ৬.২×১০^{১৮} (১০ এর সাথে ১৮টি শূন্য যোগ করলে যে বিরাট সংখ্যা হয়) সংখ্যক ইলেকট্রন ঐ তারের একটি পয়েন্ট দিয়ে গতিশীল আছে।**

খ. আপেক্ষিক পার্থক্য (Potential Difference)

যখন আমরা একটি ব্যাটারির উভয় টার্মিনাল কোনো কন্ডাক্টিং তার দ্বারা সংযুক্ত করি তখন ইলেকট্রিক কারেন্ট ঐ তারের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে। দু'টি টার্মিনালের একটি ইলেকট্রন সর্বদাই ছাড়তে থাকে আর অপর টার্মিনাল তা গ্রহণ করে নেয়। আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি কি পরিমাণ ইলেকট্রন (অণুর ক্ষুদ্রতম বস্তু) তারের মধ্যদিয়ে প্রতি সেকেন্ডে চলমান আছে তার হিসাব করা হয় আম্পিয়ার ইউনিট দ্বারা। তবে কোন্ শক্তিটি এসব ইলেকট্রনকে উভয় টার্মিনেলের মধ্যে পরিচালনা করে? এই শক্তিটির নামই হচ্ছে ভলটেজ বা পটেনশিয়্যাল ডিফারেন্স। ভলটেজ বেশি হওয়ার অর্থ হলো টার্মিনেল থেকে বেশী কারেন্ট চলন্ত হওয়া আর কম ভলটেজ হওয়ার অর্থ হলো এর বিপরীত তথা টার্মিনেল থেকে কম কারেন্ট চলন্ত থাকা।

গ. বৈদ্যুতিক রোধশক্তি (Electrical Resistance)

এটাও একটি ইলেকট্রিকেল ইউনিট। কোনো কন্ডাকটারই ইলেকট্রিকেল কারেন্টকে তার মধ্যদিয়ে চলতে পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করে না। কন্ডাকটারের নিজস্ব এটম ও চলন্ত ইলেকট্রনের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। এর ফলে ইলেকট্রন চলার মধ্যে বাধার সৃষ্টি হয়। এই বধাকেই বলে রেজিসটেন্স। ওহ্‌ম (ohms) নামক ইউনিট দ্বারা এটা মাপা হয়- এবং এর সংকেত হলো গ্রীক অক্ষর Ω (ওমেগা)।

একটি ভালো কন্ডাকটার সেটি, যার মধ্য দিয়ে অনায়াসে ইলেকট্রন চলতে পারে। অপরদিকে একটি ভালো ইনস্যুলেটর (Insulator) এর মধ্যদিয়ে কারেন্ট ভালো চলে না। অর্থাৎ ভালো ইনস্যুলেটরে উচ্চ রেজিটেন্স বিদ্যমান।

কারেন্ট, ভলটেজ ও রেজিসটেন্সের মধ্যে সম্পর্ক বিদ্যমান। যে আইনের মাধ্যমে এই সম্পর্ককে বুঝানো হয়েছে তার নাম হলো **'ওহ্‌ম'স ল' (Ohm's Law)**। এই আইনটি একটি সমীকরণ দ্বারা বুঝানো যায়, যথা:

$$V = IR \text{ --------- ১.১}$$

এখানে V হলে ভলটেজ (ভল্টস), I হলো ইলেকট্রিক কারেন্ট (আম্পিয়ার) এবং R হলো রেজিসটেন্স (ওহ্মস্)। আমরা এই মৌলিক সমীকরণ ব্যবহার করে ইলেকট্রিকেল তিনটি ইউনিটের যে কোনো একটি অঙ্ক কষে বের করতে পারবো যদি অপর দু'টি জানা থাকে। সাধারণ বীজগণিতের আইন মুতাবিক আমরা উপরোক্ত (১.১) সমীকরণকে পাল্টে আরো দু'টো সমীকরণ লিখতে পারি, যথা:

$$I = V/R \text{ --------- ১.২}$$

এবং

$$R = V/I \text{ --------- ১.৩}$$

উপরোক্ত সমীকরণত্রয়ের কোনটি আমরা অঙ্ক কষতে কাজে লাগাবো তা নির্ভর করবে কোন্ দু'টি ইউনিট বা মাপ আমাদের জানা আছে। এখন মনে করুন ভলটেজের মাত্রা ২২০ এবং কারেন্টের মাত্রা ১৩। আমরা এ ক্ষেত্রে রেজিসটেন্স বের করতে যেয়ে সমীকরণ ১.৩ ব্যবহার করবো। অর্থাৎ $R = 220/13 = 16.915 = 17$ (appx.) Ω। অনুরূপ, যদি কারেন্ট ও রেজিসটেন্টের মান আমাদের জানা থাকে তাহলে সমীকরণ ১.১ ব্যবহার করে ভলটেজ বের করতে পারি। আর ভলটেজ এবং রেজিসটেন্ট জানা থাকলে কারেন্টের মান সমীকরণ ১.২ এর মাধ্যমে বের করতে সক্ষম হবো।
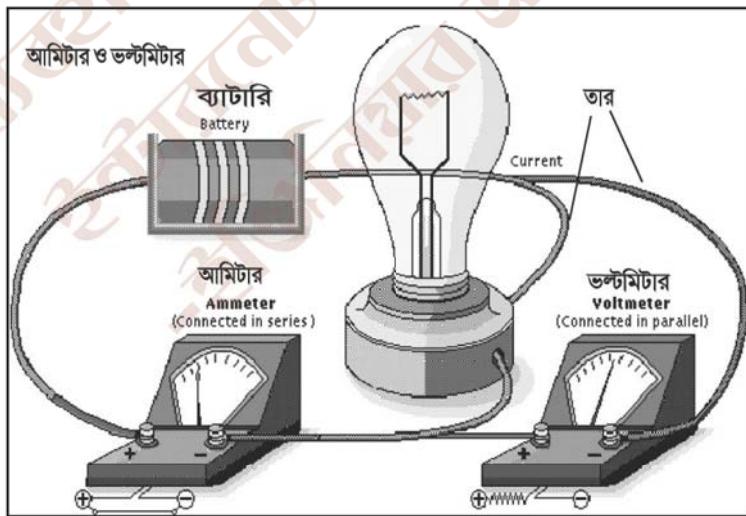
আমরা ইতোমধ্যে ইলেকট্রিকেল সার্কেটে তিনটি মৌলিক পরিমাপের কথা আলোচনা করেছি। এসব ইউনিট মাপার দু'টি যন্ত্র তথা আমিটার ও ভল্টমিটারের উপর এখন আরো কিছু তথ্যাদি তুলে ধরার প্রয়াস পাচ্ছি। লক্ষণীয় ব্যাপার হলো ইলেকট্রিকেল রেজিসটেন্স মাপার জন্য আলাদা কোনো যন্ত্রের প্রয়োজন নেই। আমরা যখন আমিটার দ্বারা কারেন্টের রেইট এবং ভল্টমিটার দ্বারা ভলটেজের রেইট জেনে নেবো তখন ওহমস আইন (উপরোক্ত সমীকরণত্রয় ১.১ ... ১.৩) কাজে লাগিয়ে অনায়াসেই রেজিসটেন্স সংখ্যাটি অঙ্ক কষে বের করতে পারি। ইলেকট্রিকেল সার্কেটে আমিটার ও ভল্টমিটার কিভাবে ব্যবহৃত হয় তার একটি চিত্র উপরে (পূর্বের পৃষ্ঠায়) তুলে ধরা হলো। আমরা দেখতে পাচ্ছি সার্কেটের আমিটার ও ভল্টমিটার দু'টি ভিন্ন পদ্ধতিতে সংযুক্ত করা হয়েছে। এই পদ্ধতিদ্বয় হলো আমিটারের জন্য 'সিরিজ সংযোগ' (Series connection) এবং ভল্টমিটারের জন্য 'প্যারালেল সংযোগ' (Parallel connection) ব্যবহৃত হয়েছে। এই দু'টি সংযোগ অত্যন্ত জরুরী। নিচের চিত্রের সাহায্যে আমরা এ ব্যাপারে আরোও ব্যাখ্যা তুলে ধরছি।

নিম্নে দেখানো সিরিজ সংযুক্ত বাল্বগুলোর একটি যদি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে পুরো সার্কেটে আর কারেন্ট চলবে না। অপরদিকে দ্বিতীয় প্যারালেল সার্কেটে একটি বাল্ব নষ্ট

হয়ে গেলেও কারেন্ট চলতে থাকবে। সুতরাং প্যারালেল সার্কেট ঘর-বাড়িতে সর্বত্র ব্যবহৃত হয়।

এবার আমিটার ও ভল্টমিটার উপরের চিত্রে কেনো যথাক্রমে সিরিজ ও প্যারালাল সংযোগ করা হয়েছে সে ব্যাপারে আমাদেরকে জানতে হবে। আমিটার দ্বারা তারের মধ্যে কারেন্টের মাত্রা মাপা হয়। সুতরাং কারেন্ট বা ইলেকট্রন আমিটারের ভেতর দিয়ে চলার সময় আমিটার গতির রেইট মেপে ডায়ালে দেখাবে। এ ক্ষেত্রে সিরিজ সংযোগ একান্ত জরুরী। অপরদিকে ভল্টমিটার দ্বারা আমরা ব্যাটারির উভয় টার্মিনালের মধ্যে আপেক্ষিক পার্থক্য মেপে দেখবো বিধায় এই সংযোগ প্যারালেল হতে হবে। লক্ষ করুন প্যারালেল সংযোগ মূলত উভয় টার্মিনেলের সঙ্গে সংযোগের নামান্তর।

২.২ তাপমানযন্ত্র (Thermometer)

থার্মোমিটার সবার জানা-চেনা একটি যন্ত্র। এর দ্বারা আমরা দেহের তাপ নির্ণয় করে থাকি। এরূপ যন্ত্রের মৌলিক অংশগুলো হলো গ্লাস টিউব ও তাতে রক্ষিত তরল ধাতু
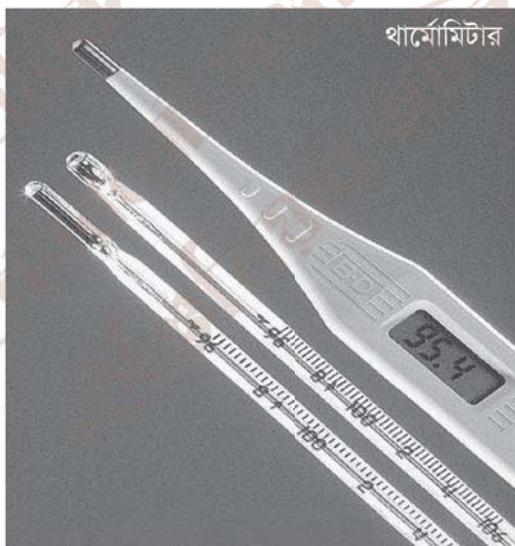
পারদ কিংবা সুরা (অ্যালকাহল)। এই উভয় পদার্থ তাপের ফলে আয়তনে বাড়ে তাই

এগুলোর ব্যবহার। গ্লাস টিউবে বা তার পার্শ্বে স্থাপিত অন্য কোনো বস্তুর মধ্যে তাপের স্কেল লিখা থাকে। আমরা তাপের পরিমাণ এই স্কেল থেকে পড়ে নিতে পারি। উপরে তিনটি থার্মোমিটারের চিত্র দেওয়া হলো। লক্ষ করুন একটি থার্মোমিটারে তাপমাত্রা নাম্বারের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে। এরূপ থার্মোমিটারকে বলে **'ডিজিটেল থার্মোমিটার'**।

আমরা সবাই জানি থর্মোমিটার দ্বারা তাপমাত্রা ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড কিংবা ডিগ্রী ফারেনহাইট ইউনিটে মাপা হয়। তবে তাপ মূলত কোন্ জিনিসকে বলে? বিজ্ঞান এই তাপকে কিভাবে সংজ্ঞায়িত করেছে? এসব প্রশ্নের জবাব কি তা এবার জেনে নেওয়া যাক।

২.৩ তাপ (Heat)

কোনো বস্তুর এক অংশ থেকে অন্য অংশে কিংবা এক দেহ থেকে অপর দেহে তাপমাত্রার (Temperature) পার্থক্য দ্বারা এনার্জি (উদ্যম) স্থানান্তর হওয়াকে তাপ (Heat) বলে।

উপরোক্ত সংজ্ঞার বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রয়োজন। **তাপ হলো চলন্ত এনার্জির নাম**। এটা সাধারণত উচ্চ তাপযুক্ত বস্তু থেকে নিম্ন তাপযুক্ত বস্তুতে স্থানান্তর হয়। এর উল্টোটা প্রায় হয়ই না। ঠাণ্ডা বস্তু গরম বস্তুকে ঠাণ্ডা করে না বরং গরম বস্তুতে ঠাণ্ডা বস্তুর ছোঁয়া লাগলে তাপ ঐ ঠাণ্ডা বস্তুতে স্থানান্তরিত হয়। এতে ঠাণ্ডা বস্তুর তাপমাত্রা বাড়ে ও গরমটির তাপমাত্রা কমে। কথাটা ভালোভাবে বুঝার জন্য নিচের চিত্রটি দেখুন।

তাপমাত্রা নির্ণয়ে সচরাচর দু'টি ইউনিট ব্যবহৃত হয়। এ দু'টোর প্রথমটি হলো ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড বা সেলসিয়াস (Centigrade or Celsius) আর অপরটি ডিগ্রী ফারেনহাইট (Fahrenheit)। এই দু'টো তাপ ইউনিটের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ে আমরা নিম্নোক্ত সমীকরণদ্বয় ব্যবহার করতে পারি।

$$C = (F - 32) \times 10/18 \;....2.1$$
$$F = (C \times 18/10) + 32 \;....2.2$$

উপরোক্ত সমীকরণদ্বয়ে C হলো সেলসিয়াস বা সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা এবং F হলো ফারেনহাইট স্কেলে তাপমাত্রা। সুতরাং আমরা যদি ফারেনহাইট স্কেলে তাপমাত্রা ৬৮ ডিগ্রী বলে জানি তাহলে সমীকরণ ২.১ ব্যবহার করে অনায়াসেই সেন্টিগ্রেড স্কেলের মাত্রা বের করতে পারি। তাহলো: $C = (68 - 32) \times 10/18 = 20\ {}^{0}C$। অপরদিকে আমরা যদি ৫০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের ফারেনহাইট মান নির্ণয় করতে চাই তাহলে সমীকরণ ২.২ ব্যবহার করতে পারি, যথা: $F = (50 \times 18/10) + 32 = 122\ {}^{0}F$।

২.৪ আবহমানযন্ত্র (Barometer)

আমাদের পৃথিবীর চতুর্দিকে একটি বায়ুমণ্ডল আছে। এই বায়ুমণ্ডলের ওজন থেকে একটি চাপ সৃষ্টি হয়। এই চাপকে বলে আবহমণ্ডলের চাপ (Atmospheric pressure)। আবহাওয়ার পূর্বাভাস দিতে যেয়ে এই চাপ কোন্ সময় কি পরিমাণ আছে তা মাপতে হয়। যে যন্ত্রের মাধ্যমে তা আঞ্জাম দেওয়া হয় তাকেই বলে আবহমানযন্ত্র (Barometer)।

পারদ বেরোমিটার (Mercury Barometer) সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়। এটা দেখতে অনেকটা থার্মোমিটারের মতো। অপর আরেক ধরনের বেরোমিটার আছে। এটাকে বলে অ্যানেরইড বেরোমিটার (Aneroid Barometer)। সাগর লেবেলে আবহমণ্ডলের ওজন বিশেষভাবে ক্রমাঙ্কন নির্ণিত কাচের চোঙ্গা বা টিউবে রক্ষিত পারদকে ৭৬০ মিমি উপরে তুলে। তবে সাগর লেবেল থেকে উপরিস্থ কোনো স্থানে পারদ উপরের দিকে কম উঠবে। এর কারণ হলো, সেখানে বায়ুর মাত্রা কম। সুতরাং আবহমণ্ডলের চাপ উচ্চতা ও বায়ুর মাত্রার উপর নির্ভরশীল। পারদভর্তি টিউবের ব্যবহার হয়ে থাকে পারদ বেরোমিটারে (নিচের পরের পৃষ্ঠার চিত্র দেখুন)।

অ্যানেরইড বেরোমিটার কিছুটা ভিন্ন। একটি ধাতুর তৈরী ড্রাম থেকে বাতাসের একাংশ বের করে নিয়ে এটাকে আংশিক বাতাসশূন্য করা হয়। এর ফলে বাতাসের মধ্যে চাপের তারতম্যের সঙ্গে ড্রামের মধ্যেও পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনকে কিছু গিয়ার সিস্টেম দ্বারা ঘড়ির ডায়ালের মতো একটি ডায়ালে কাটা বা পয়েন্টার দিয়ে তা দেখানো হয়। (নিচের চিত্রটি দেখুন)। অ্যানেরইড বেরোমিটারকে একটু পরবির্তন করে বিমানে ব্যবহৃত উচ্চতা মাপার মিটার অ্যালটিমিটার (Altimeter) তৈরী করা হয়। যেহেতু উচ্চতার সঙ্গে চাপের সম্পর্ক বিদ্যমান তাই অ্যালটিমিটার দ্বারা বিভিন্ন উচ্চতায় বায়ুচাপের মাত্রা নির্ণয় হলে অনায়াসেই আমরা সাগর লেবেল থেকে উচ্চতা অঙ্ক কষে বের করতে পারি। বাস্তবে এই অঙ্ক কষার কাজটি মিটারই করে থাকে। সুতরাং
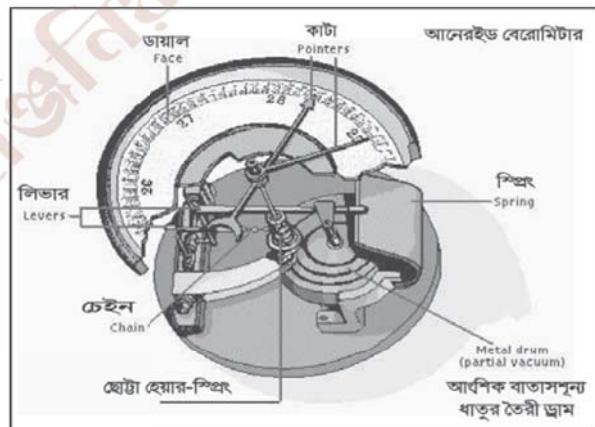
পাইলট যা দেখেন তাহলো মিটার কিংবা ফুট অংকে উচ্চতার পরিমাণ। আরেক ধরনের অ্যালটিমিটার আছে যার নাম রেডিওঅ্যালটিমিটার (Radioaltimeter)। বিমানের গায়ে একটি রেডিও যন্ত্র লাগানো থাকে। সেখান থেকে একটি ইলেকট্রমেগনাটিক রেডিও তরঙ্গ বা সিগনাল নিচের দিকে পাঠানো হয়। এই তরঙ্গ মাটিতে লেগে আবার ফিরে এসে বিমানের রাডার যন্ত্রে পৌঁছে। সিগনালটি যাওয়া-আসার মধ্যে যে সময় অতিবাহিত হয় তা থেকেই দূরত্ব মেপে বিমানের উচ্চতা নির্ণয় করা যায়। আলোকরশ্মি বা যে কোনো ইলেকট্রমেগনাটিক সিগনাল একটি নির্দিষ্ট গতিতে চলে। নিম্নের সমীকরণ ব্যবহার করে উচ্চতা নির্ণয় করা হয়:

$$h = tc/2 \quad ..... \quad 2.3$$

উক্ত সমীকরণে h হচ্ছে উচ্চতা, t হলো সিগনাল পাঠানো ও ফেরৎ আসার মধ্যে যেটুকু সময় লেগেছে তার হিসাব এবং c হচ্ছে আলোকের গতি যা ৩,০০,০০০ (তিন লক্ষ) কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ড।

২.৫ গাইগার কাউন্টার (Geiger Counter)

পৃথিবীতে অনেক বিশুদ্ধ পদার্থ ও যুক্ত পদার্থ আছে যেগুলো মূলত তেজস্ক্রিয় (Radioactive)। এসব বস্তুর এটম থেকে পরমাণু বিকিরণ হয়। কোনো বিশেষ বস্তু থেকে কি পরিমাণ পরমাণু বিকিরণ হচ্ছে তার একটি মাপ সময় সময় প্রয়োজন হয়। যে যন্ত্রের মাধ্যমে তা আঞ্জাম দেওয়া হয় সেটির নাম হলো গাইগার কাউন্টার। সাধারণত তেজস্ক্রিয়তা মানুষের স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। এ থেকে মারাত্মক ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। গাইগার কাউন্টার অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যরক্ষার্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। একজন মানুষ সীমিত পরিমাণ তেজস্ক্রিয়তার মধ্যে নিজেকে উন্মুক্ত করতে পারে। অতিরিক্ত হলেই স্বাস্থ্যের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। তেজক্রিয়তাসম্পন্ন পারিপার্শ্বিকতায় কর্মরত সবার জন্য গাইগার কাউন্টার দ্বারা তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা জেনে নেওয়া তাই স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত জরুরী। বায়ে একটি গাইগার কাউন্টারের ছবি তুলে ধরা হলো।

২.৬ গতিমিটার (Speedometer)

গাড়ির গতি, মোটর-জেনারেটরের ঘূর্ণন, বিমানের গতির রেইট ইত্যাদি মাপার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহৃত হয় তাকেই বলে গতিমিটার (Speedometer)। যন্ত্রটি দু'টি উপায়ের যে কোনো একটির মাধ্যমে কাজ করে। প্রথমটি হলো: নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক'বার কোনো বিশেষ অংশ ঘুরছে (number of revolutions per second, minute etc.) তা জানা; এবং দ্বিতীয়টি হলো: প্রতি মিনিটে ক'বার কোনো বিশেষ অংশ ঘুরছে (revolutions per minute (rpm)) তা সরাসরি যন্ত্র থেকে জেনে নেওয়া।

দৃষ্টন্তস্বরূপ যানবাহনে ব্যবহৃত গতিমিটার কিভাবে কাজ করে তা আমরা জেনে নিতে পারি। যানবাহনে দু' ধরনের গতিমিটার আছে। এর প্রথমটি হলো মেকানিকেল ও দ্বিতীয়টি ইলেকট্রিকেল। প্রথমটিতে থাকে ড্রাইভের সঙ্গে সংযুক্ত একগাছি তার। এটা যন্ত্রের মধ্যস্থ একটি স্থায়ী চুম্বকখণ্ডকে ঘুরাতে থাকে। এর ফলে চতুর্দিকের ড্রামের মধ্যে সৃষ্টি হয় একটি মেগন্যাটিক ফিল্ড বা শক্তি। এই শক্তি ড্রামটিকে চুম্বকখণ্ডের সাথে ঘুরাতে চেষ্টা চলায়। কিন্তু ড্রামকে একটি স্প্রিং বিপরীত শক্তি দ্বারা আটকে রাখার চেষ্টা করে। এই স্প্রিংয়ের সঙ্গে থাকে ঘড়ির কাটার মতো একটি কাটা। সুতরাং গতি যতো বেশি হবে ঐ চুম্বক থেকে ততো বেশি শক্তি ড্রামের মধ্যে ক্রিয়া করবে- এবং এ থেকে কাটা ততো বেশি ডানে ঘুরে যাবে।

দ্বিতীয় প্রকারের গতিমিটারের মূলে যে যন্ত্রটি থাকে তাহলো ট্রান্সমিশন সিস্টেমে স্থাপিত একটি ইলেকট্রিকেল যন্ত্র। গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই যন্ত্র থেকে একটি ইলেকট্রিকেল পালস বা সিগনাল বেরিয়ে আসে। এই সিগনালকে গতিমিটার বৈদ্যুতিক উপায়ে গবেষণা শেষে ডায়ালের মধ্যে গতির পরিমাণ দেখিয়ে দেয়। আজকাল যানবাহনে এ ধরনের জটিল কিন্তু উন্নতমানের ইলেকট্রিকেল গতিমিটারই বেশি ব্যবহৃত হয়। ডানে একটি গতিমিটারের ছবি তুলে ধরা হলো।
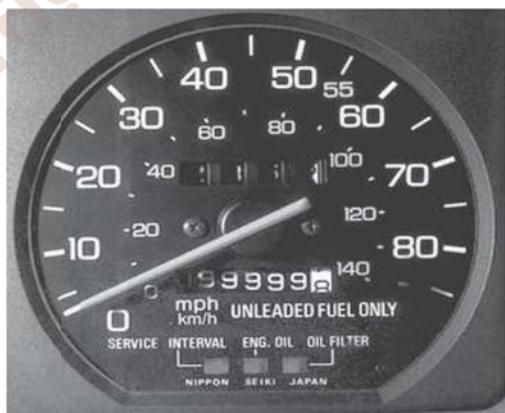
তৃতীয় অধ্যায়

মাপের ইউনিট্‌স ও ব্যবহারিক গণিত

আমরা প্রথম অধ্যায়ে এসআই ইউনিট্‌স ও অন্যান্য সচরাচর ব্যবহৃত মাপজোখের ইউনিট (বা একক) নিয়ে বিস্তারিত পরিচিতি তুলে ধরেছি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ৬টি ভিন্ন যন্ত্রের ব্যাপারে জ্ঞাতব্য কিছুটা আলোচনা হয়েছে। বর্তমান ও পরবর্তী সকল অধ্যায়গুলো পাঠ ও অনুধাবনের ক্ষেত্রে আগের ঐ অধ্যায়দ্বয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। বর্তমান এই অধ্যায়ে আমরা ব্যবহারিক গণিতের আসল স্বরূপ জেনে নেবো। প্রথম অধ্যায়ে বর্ণিত কয়েকটি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইউনিটের সঙ্গে ব্যবহারিক গণিতের সম্পর্ক এখানে বর্ণিত হবে।

৩.১ ক্ষেত্রফল ও ঘনফল (Areas & Volumes)

আমাদেরকে প্রায়শঃই বিভিন্ন বস্তু ও সমতলের (Body & plane) ক্ষেত্রফল (Area) এবং ঘনফল (Volume) সঠিকভাবে নির্ণয় করতে হয়। প্রথম অধ্যায়ে আমরা একটি বিল্ডিং ডিজাইনের ফ্লোর প্ল্যান অঙ্কন করেছি। পুরো প্লট, ইমারত-ক্ষেত্র এবং প্রতিটি কক্ষের ক্ষেত্রফল আমাদেরকে বের করতে হয়েছে। সমতল হিসাবে অঙ্কিত ২ বিস্তৃতিসম্পন্ন ফিগারের ক্ষেত্রফল বের করা অনেকটা সহজ, যেমনটি আমরা বিল্ডিংয়ের প্ল্যান-অঙ্কন থেকে বের করেছি। তবে সময় সময় বেশ জটিল ক্ষেত্রেরও ক্ষেত্রেফল বের করার প্রয়োজন হয়। আমরা একটু পরই এরূপ ক'টির উদাহরণ তুলে ধরবো। প্রথমে আমাদেরকে ক্লাসিকেল ক'টি ফিগার ও ঘন বস্তুর উপর কিছুটা জেনে নিতে হবে।

৩.১.১ সমকোণী ত্রিভুজ ও পিথাগোরিয়ান উপপাদ্য (Right-angled triangle & Pythagorean theorem)
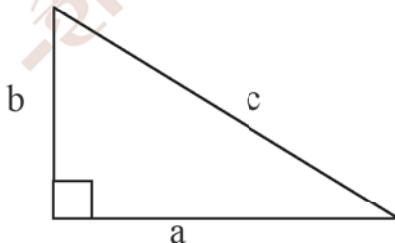
উপরে (পূর্বের পৃষ্ঠায়) একটি সমকোণী ত্রিভুজ দেখানো হয়েছে। প্রখ্যাত পিথাগোরিয়ান উপপাদ্যে বলা হয়েছেঃ **একটি সমকোণী ত্রিভুজের বাহু এডজেসেন্ট (a) এর স্কোয়ার ও বাহু অপোজিট (b) এর স্কোয়ার = বাহু হাইপোথিনিউজ (c) স্কোয়ার। অঙ্কে বলা যায়ঃ $\mathbf{a^2 + b^2 = c^2}$।**

আমরা নিম্নে অঙ্কিত চিত্রের সাহায্যে এই উপপাদ্যের প্রমাণ করতে পারি। দেখুন, কিভাবে দুই বাহুর স্কোয়ার মিলে হাইপোথিনিউজের স্কোয়ারের (এখানে সাইড c)
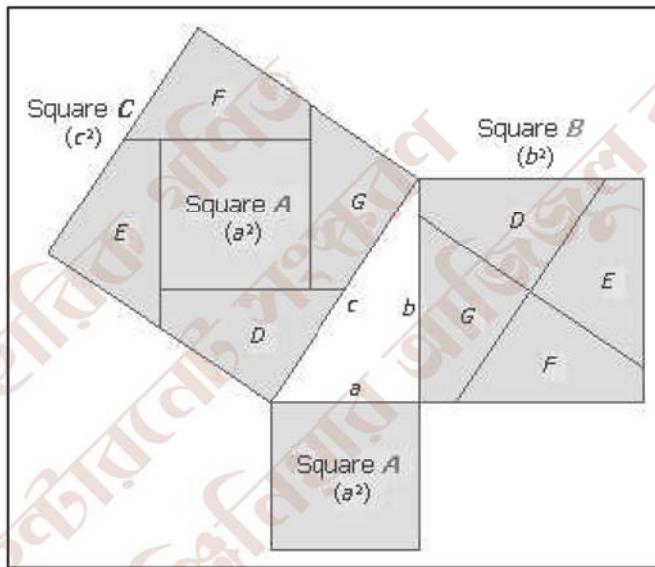
সমান হয়েছে। থিওরেম তা-ই বলেছে। আমরা প্রয়শঃই এই ত্রিভুজ বাস্তব ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি।

৩.১.২ অন্যান্য ত্রিভুজ (Other triangles)

ইতোমধ্যে বর্ণিত সমকোণী ত্রিভুজ ছাড়াও আরো কয়েক ধরনের ত্রিভুজ আছে। এগুলোর প্রত্যেকটির চিত্রসহ নিচে পূর্ণ ব্যাখ্যা তুলে ধরা হলো।

ক. বিষমবাহু ত্রিভুজ (Scalene) : এই ত্রিভুজের কোনো বাহুই পরস্পর সমান নয় (চিত্র-১)।

খ. সমবাহু ত্রিভুজ (Equilateral) : এই ত্রিভুজের তিনটি বাহুই সমান থাকে। ভেতরের প্রতিটি কোণ্ও সমান হবে, আর তাহলো ৬০° (চিত্র-২)

গ. সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ (Isosceles): এই ত্রিভুজের দু'টি বাহু পরস্পর সমান (চিত্র-৩)। এই ত্রিভুজের দু'টি কোণও সমান হবে।
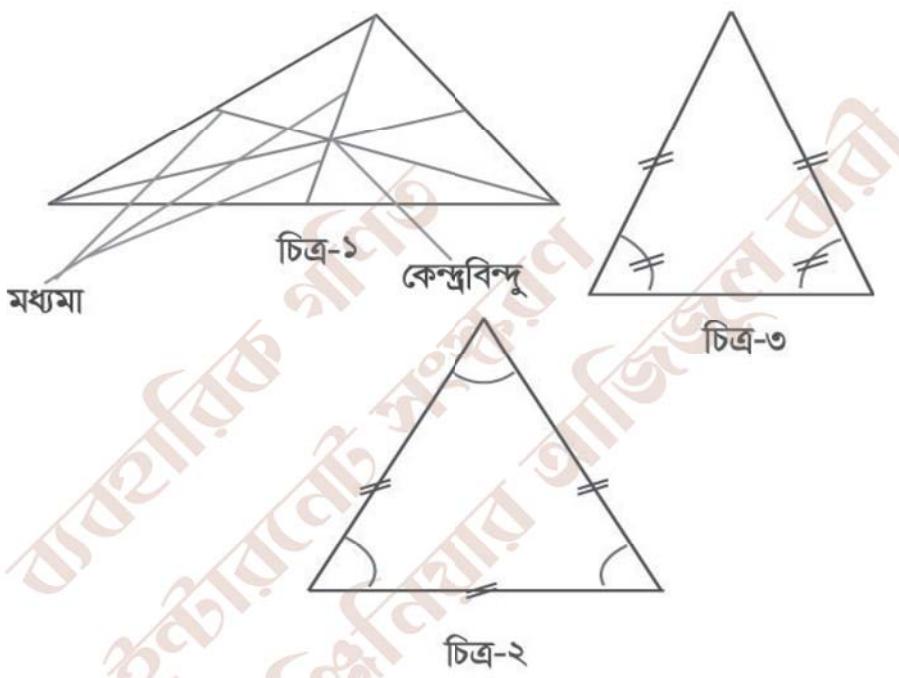
ত্রিভুজ সম্পর্কে আমাদেরকে আরো যাকিছু জানার প্রয়োজন- তাহলো:

১. ত্রিভুজের বৃহত্তর কোণের বিপরীত বাহু বৃহত্তর হয়।

২. যদি বৃহত্তম কোণটি সূক্ষ্মকোণ (<৯০°) হয় তাহলে এটাকে সূক্ষ্মকোণী (acute) ত্রিভুজ বলে।

৩. যদি বৃহত্তম কোণটি সমকোণ (=৯০°) হয় তাহলে এটাকে সমকোণী (right) ত্রিভুজ বলে।

৪. যদি বৃহত্তম কোণটি স্থুলকোণ (>৯০°) হয় তাহলে এটাকে স্থুলকোণী (obtuse) ত্রিভুজ বলে।
৫. কোনো ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু থেকে বিপরীত বাহুর মধ্যবিন্দুতে অঙ্কিত সরল রেখাংশটিকে বলে মধ্যমা (Median)।
৬. যে কোনো ত্রিভুজের তিনটি মধ্যমা (Median) পরস্পরকে যে বিন্দুতে ছেদ করে তাকে বলে কেন্দ্রবিন্দু (Centroid)। দেখুন চিত্র-১।
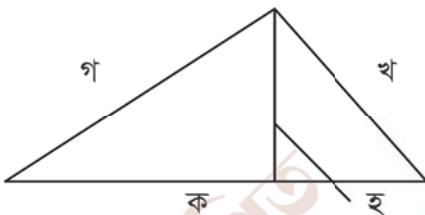
৭. যে কোনো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = ১/২×উচ্চতা (হ)×বেইজ (ক)।
৮. যে কোনো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল (তিন বাহুর মান জানা থাকলে)
$= \sqrt{স(স-ক)(স-খ)(স-গ)}$ এখানে স = ১/২(ক+খ+গ)।
৯. সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল $=\sqrt{৩}/৪ \times এ^{২}$ এখানে এ = বাহুর মাপ।
১০. যে কোনো ত্রিভুজের অভ্যন্তরীণ কোণের সমষ্টি = ১৮০°।

৩.১.৩ ত্রিভুজ ও ত্রিকোণমিতি (Triangles & Trigonometry)

ত্রিভুজ ও এদের বিভিন্ন কোণ নিয়ে গবেষণার নাম হলো ত্রিকোণমিতি। ব্যবহারিক গণিতে বিভিন্ন ত্রিভুজের কোণ ও বাহুর মান নির্ণয়ে আমাদেরকে সময় সময় ত্রিকোণমিতি ও এর আইন-কানুন কাজে লাগাতে হয়। এ বিষয়টির উপর তাই মৌলিক কিছু ব্যাপার জেনে নিতে হবে। আমরা এখানে শুধুমাত্র আইন-কানুনগুলো তুলে ধরবো। এগুলোর কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করবো না। শিক্ষার্থীরা নিশ্চয়ই এসব প্রমাণ সম্পর্কে ওয়াকিফহাল আছেন। ব্যবহারিক গণিতের জন্য জরুরী নিম্নলিখিত কয়েকটি ত্রিকোণমিতির আইন-কানুন আমাদের জানা দরকার।

ক. সমতল ত্রিকোণমিতির আইন-কানুন (Rules of plane trigonometry)

ক.১. ত্রিকোণমিতি ফাংশন্স (Trigonometric Functions): মোট ৬টি ফাংশন বা সমীকরণ আছে যেগুলো ব্যবহারিক গণিতে অত্যন্ত উপযোগী। এগুলো হলো (উপরের ত্রিভুজ মুতাবিক):

১. কোণ θ এর সাইন (Sin θ) = অপোজিট / হাইপোথিনিউজ = অ/হ।
২. কোণ θ এর কোসাইন (Cos θ) = বেইজ / হাইপোথিনিউজ = ব/হ।
৩. কোণ θ এর টানজেন্ট (Tan θ) = অপোজিট / বেইজ = অ/ব।
৪. কোণ θ এর কোটানজেন্ট (Cot θ) = বেইজ / অপোজিট = ব/অ।
৫. কোণ θ এর সিকেন্ট (Sec θ) = হাইপোথিনিউজ / বেইজ = হ/ব।
৬. কোণ θ এর কোসিকেন্ট (Csc θ) = হাইপোথিনিউজ / অপোজিট = হ/অ।

ক.২. ত্রিকোণমিতি ও সাধারণ ত্রিভুজ (Trigonometric & General Triangle)

যে কোনো ত্রিভুজের বিভিন্ন বাহু ও কোণের মাত্রা নির্ণয়ে আমার ত্রিকোণমিতির নিম্নলিখিত তিনটি আইনের যে কোনো একটি ব্যবহার করতে পারি। এই আইনগুলো হলো:

১. সাইন আইন (Sin Rule): **এ/সাইন অ = ব/সাইন আ = স/সাইন ই**। এখানে এ বাহুর বিপরীত কোণ হলো অ, ব বাহুর বিপরীত কোণ হলো আ এবং স বাহুর বিপরীত কোণ হলো ই।

২. কোসাইন আইন (Cosine Rules): (ক) **এ^{২}=ব^{২}+স^{২} - ২ব×স×কোসাইন অ**; (খ) **ব^{২}=এ^{২}+স^{২} - ২এ×স×কোসাইন আ**; (গ) **স^{২}=এ^{২}+ব^{২} - ২এ×ব×কোসাইন ই**। এখানে এ বাহুর বিপরীত কোণ হলো অ, ব বাহুর বিপরীত কোণ হলো আ এবং স বাহুর বিপরীত কোণ হলো ই।

৩. টানজেন্ট আইন (Tangent Rule): **(ক) (এ-ব)/(এ+ব) = (টানজেন্ট ১/২(অ-আ)/(টানজেন্ট ১/২(অ+আ) ; (খ) (ব-স)/(ব+স) = (টানজেন্ট ১/২(আ-ই)/(টানজেন্ট ১/২(আ+ই) ; (গ) (এ-স)/(এ+স) = (টানজেন্ট ১/২(অ-স)/(টানজেন্ট ১/২(অ+স)**। এখানে এ বাহুর বিপরীত কোণ হলো অ, ব বাহুর বিপরীত কোণ হলো আ এবং স বাহুর বিপরীত কোণ হলো ই।
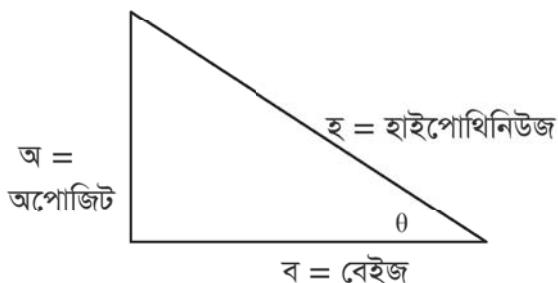
আপাতত আমাদের জন্য ত্রিকোণমিতির উপরোক্ত আইনগুলো জেনে নেওয়াই যথেষ্ট হবে। সুতরাং শিক্ষার্থীদেরকে এগুলো সম্পর্কে ওয়াকিফহাল থাকা জরুরী। এসব আইন-কানুন দিয়েই আমাদেরকে সমতল ক্ষেত্রের অনেক সমস্যার সমাধান বের করতে হবে।

৩.১.৪ বৃত্ত, গোলক ও অন্যান্য ত্রিমাত্রিক বস্তু (Circles, spheres & other solids)

বৃত্ত ও তার বিভিন্ন অংশ
(Circle & parts)
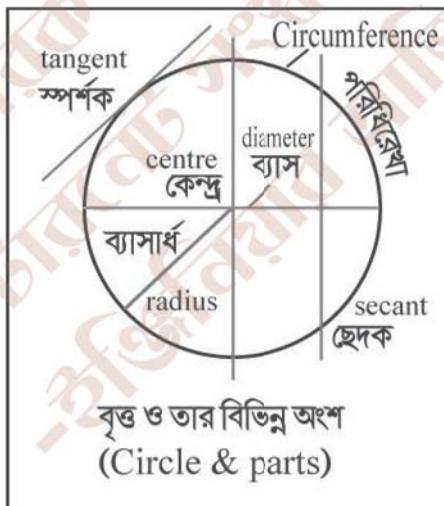
উপরের চিত্রে বৃত্তের বিভিন্ন অংশ দেখানো হয়েছে।
বৃত্ত সম্পর্কে আমাদেরকে যা জানার তা নিম্নরূপঃ

১. বৃত্তের পরিধি (Circumference) = ২πr। এখানে π = ৩.১৪১৫৯২৬৫৪ (তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ৩.১৪ হলেই যথেষ্ট হবে) এবং r হলো বৃত্তের ব্যাসার্ধ।

২. বৃত্তের ক্ষেত্রফল (Area) = πr^2।

Sphere (গোলক)

গোলক (Sphere) ঃ ডানে একটি গোলক দেখানো হয়েছে। গোলক সম্পর্কে আমাদের জানার যা তাহলো:

১. এর ক্ষেত্রফল = $4\pi r^2$ ও ২. এর ঘনফল = $4\pi r^3/3$। উভয় ক্ষেত্রে r হলো ব্যাসার্ধ এবং π (পাই) = ৩.১৪১৫৯২৬৫৪।

অন্যান্য ত্রিমাত্রিক ফিগার ঃ নিম্নের (বায়ের) চিত্রে কয়েকটি সচরাচর ব্যবহৃত বিভিন্ন ত্রিমাত্রিক বস্তু বা সলিডস্ অঙ্কিত হয়েছে। ছবিতে এসব বস্তুর ঘনফল দেওয়া আছে।
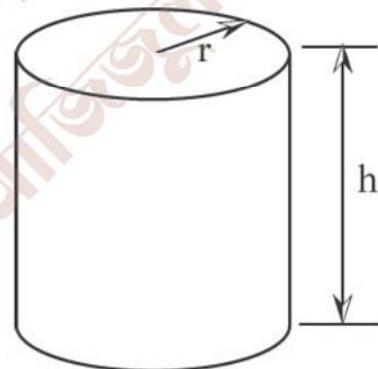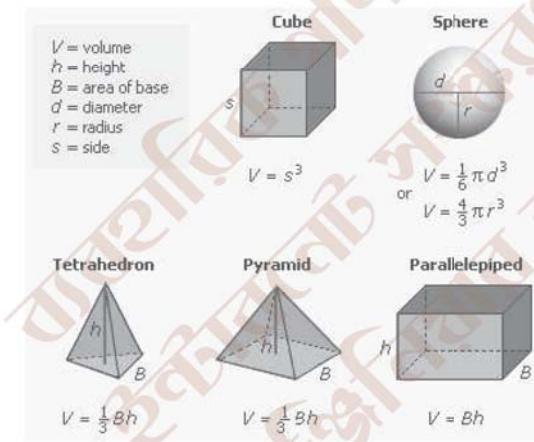
উপরের (ডানের) চিত্রে যে বস্তুটি দেখানো হয়েছে তাহলো সিলিন্ডার। কৌন ও পিরামিডের ভলিউম একই।

রেগুলার সিলিন্ডারের ঘনফল = $\pi r^2 h$; এবং সারফেসের ক্ষেত্রফল = $2\pi r(r+h)$।

৩.১.৫ ক্ষেত্রফল ও ঘনফলের দৃষ্টান্ত (Examples of areas & volumes)

উপরে ৩.১.২ থেকে ৩.১.৪ পর্যন্ত সেকশনে আমরা বিভিন্ন সমতল ও ত্রিমাত্রিক ফিগারের উপর বিস্তারিত আলোচনাসহ ক্ষেত্রফল ও ঘনফল নির্ণয়েয় সমীকরণ উপস্থাপন করেছি। ব্যবহারিক গণিতে এসব সমীকরণের গুরুত্ব অপরিসীম। আমরা এবার নিম্নে কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরছি।

সমস্যা ১ : নিম্নের ছবিটির প্রতি লক্ষ করুন। আমাদেরকে এই সমতল ফিগারের ক্ষেত্রফল বের করতে হবে।
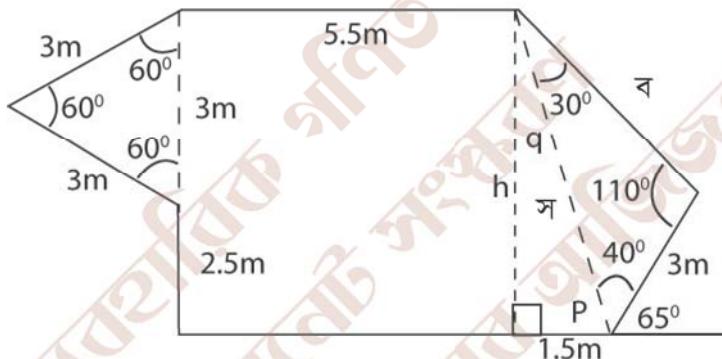
সমাধান : প্রথমে আমরা পুরো ক্ষেত্রটিকে চারভাবে বিভক্ত করে নেবো যথা: ১. বায়ের ত্রিভুজ- এটাকে আমরা ক্ষেত্র ক বলবো; ২. মাঝখানের বড় চতুর্ভুজ- এটাকে আমরা ক্ষেত্র খ বলবো; ৩. ডানের প্রথম (ডাশযুক্ত) ত্রিভুজ- এটাকে আমরা ক্ষেত্র গ বলবো; এবং ৪ ডানের অপর ত্রিভুজ- এটাকে আমরা ক্ষেত্র ঘ বলবো।

আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্ষেত্র ক বাস্তবে একটি সমবাহু ত্রিভুজ। আর সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হলো, ৩/৪×এ^২ (এখানে এ = বাহুর মাপ)। সুতরাং ক্ষেত্র ক এর ক্ষেত্রফল = ৩/৪×৩^২ = ২৭/৪ = ৬.৭৫।

ক্ষেত্র খ এর ক্ষেত্রফল = ৫.৫×৫.৫ = ৩০.২৫।

ক্ষেত্র গ একটি সমকোণী ত্রিভুজ। এর উচ্চতাও আমাদের জানা আছে। সুতরাং যে কোনো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমীকরণ আমরা ব্যবহার করতে পারি। যথা, ক্ষেত্র গ এর ক্ষেত্রফল = ১/২×উচ্চতা×বেইজ = ১/২×(২.৫+৩)×১.৫ = ৪.১২৫।

সবশেষে ক্ষেত্র ঘ হলো একটি বিষমবাহু ত্রিভুজ। এর ক্ষেত্রফল বের করতে যেয়ে আমরা প্রথমে সাইন রুল (Sine rule) ব্যবাহর করে দু'টি অজানা বাতুর মান বের করবো। সাইন রুলে বলা হয়েছে: **এ/সাইন অ = ব/সাইন আ = স/সাইন ই**। এখানে এ বাহুর বিপরীত কোণ হলো অ, ব বাহুর বিপরীত কোণ হলো আ এবং স বাহুর বিপরীত কোণ হলো ই। ক্ষেত্র ঘ এর বেলা আমরা বলতে পারি ৩/সাইন ৩০ = ব/সাইন ৪০। সুতরাং রূপান্তর করে আমরা বলতে পারি বাহু ব×সাইন ৩০ = ৩×সাইন ৪০ অথবা ব = ৩×সাইন ৪০ / সাইন ৩০ = (কালকুলেটার ব্যবহার করে) ১.৯৩/০.৫ = ৩.৮৬ (প্রায়)। এই বাহুটি হলো ৪০$^\circ$ কোণের বিপরীত বাহু।

এবার ১১০$^\circ$ বাহুর বিপরীত বাহুর (স) মান বের করতে ব্যবহার করতে পারি এই সাইন রুলটি: স/সাইন ১১০ = ৩.৮৬/সাইন ৪০; স/০.৯৩৯৭ = ৩.৮৬/০.৬৪২৮; স = ৫.৬৪ (প্রায়)। আমরা যেতেহু ত্রিভুজের তিনটি বাহুরই মান পেয়ে গেছি তাই নিম্নের সমীকরণ দ্বারা ক্ষেত্রফল বের করতে পারি:

= $\sqrt{\text{ক(ক-৩)(ক-৩.৮৬)(ক-৫.৬৪)}}$ এখানে ক = ১/২(৩+৩.৮৬+৫.৬৪)।
ক্যালকুলেটর ব্যবহার করে পাই:
ক্ষেত্রফল ঘ = $\sqrt{\text{৬.২৫(৩.২৫)(২.৩৯)(০.৬১)}}$ = ৫.৪৪।

আমরা সবক'টি ক্ষেত্রাংশের ফলাফল পেয়ে গেছি। এখন বাকী রাইলো সবগুলো যোগ করা। সুতরাং উক্ত ফিগারের ক্ষেত্রফল হলো: ক+খ+গ+ঘ = ৬.৭৫ + ৩.২৫ + ৪.১২৫ + ৫.৪৪ = ১৯.৫৭ মি^{২} (প্রায়)।

সমস্যা ২ : নিম্নের (পরের পৃষ্ঠার) সলিড বস্তুটির সারফেস ক্ষেত্রফল ও ঘনফল বের করার জন্য আমাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তা কিভাবে বের করতে হবে? শিক্ষার্থীরা উপরে বর্ণিত বিভিন্ন তথ্যাদির ভিত্তিতে অবশ্যই এর সমাধান করতে পারবেন। সুতরাং নিচে বর্ণিত সমাধানটির প্রতি লক্ষ্য না করে প্রথমে চেষ্টা করে দেখুন- কেমন?

সমাধান : চেষ্টা করে দেখেছেন? নিচের চিত্রে দেখাই যাচ্ছে কয়েকটি বিশেষ বস্তু আছে যেগুলোর সারফেস ক্ষেত্রফল ও ভলিউম আমরা আলাদাভাবে অঙ্ক কষে বের করতে পারি। প্রথমে এই বস্তুগুলোকে আলাদা করে নিই। ১. একটি পিরামিড (বেইজ চতুর্ভজের এক দিক = ৩, উচ্চতা উ = ৭); ২. দু'টি সিলিন্ডার (ব্যাসার্ধ ক = ২.৫, উচ্চতা ত = ৭); ৩. একটি গোলক (ব্যাসার্ধ গ = ৩); এবং ৪. একটি বাক্স (দৈর্ঘ্য দ = ১১, প্রস্থ প = ৫ এবং উচ্চতা জ = ৩.৫)।
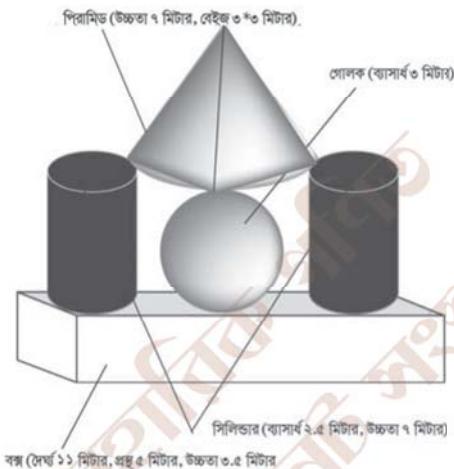
আমাদেরকে দু'টি সংখ্যা বের করতে হবে। প্রথমটি সারফেস এরিয়া যা হলো: পিরামিড সারফেস ক্ষেত্রফল + গোলক সারফেস ক্ষেত্রফল + বাক্সের সারফেস ক্ষেত্রফল (বাক্সের সারফেস ক্ষেত্রফল - উভয় সিলিন্ডারের নিচের বৃত্তের ক্ষেত্রফল) + উভয় সিলিন্ডারের সারফেস ক্ষেত্রফল (উভয় সিলিন্ডারের সারফেস ক্ষেত্রফল - নিচের বৃত্তের ক্ষেত্রফল)। এখানে আমরা কেন দু'টি ক্ষেত্রে সিলিন্ডারের নিচের বৃত্তের সারফেস ক্ষেত্রফল বাদ দিয়েছে তা-তো অবশ্যই শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারছেন। সিলিন্ডারগুলো আসলে বাক্সের উপর লাগানো আছে। অন্যগুলো একটা আরেকটাকে শুধু ছুঁইয়ে থাকায় পুরো সারফেস এরিয়া হিসাবে নিতে হবে।

১. পিরামিড সারফেস ক্ষেত্রফল: আমরা জানি একটি পিরামিডে মোট ৫টি ভিন্ন বহির্ভাগ বা ফেইস আছে। পিরামিডের উচ্চতা দেওয়া আছে ৭ মিটার ও বেইজের মাপ হলো ৩×৩ মিটার চতুর্ভুজ।

সুতরাং বেইজের সরফেস ক্ষেত্রফল = ৩×৩ = ৯ স্কোয়ার মিটার ----- ১

আমরা জানি প্রতিটি সাইড মূলত একেকটি ত্রিভুজ। আর ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলের সহজ সমীকরণ হলো: ১/২×হ×ব (এখানে হ হলো উচ্চতা এবং ব হলো বেইজের মাপ)। আমাদেরকে তাই সঠিক উচ্চতা নির্ণয় করতে হবে। নিচের চিত্র থেকে ব্যাপারটি স্পষ্ট
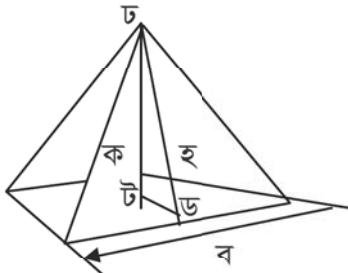
হবে। আমাদেরকে উপরের ভাস্কর্যে পিরামিডের উচ্চতা অর্থাৎ ক = ৭ মিটার বলা হয়েছে এবং ব = ৩ মিটার। পিরাডিমের একটি ফেইসের ক্ষেত্রফল বের করতে যেয়ে আমাদেরকে বাস্তবে উচ্চতা হ বের করতে হবে। কারণ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করতে যেয়ে এই মাপের দরকার। আমরা তা বের করতে যেয়ে ত্রিভুজ ঢটড ব্যবহার করতে পারি। পিথাগোরিয়ান থিওরেম অনুযায়ী:

$হ^২ = ঢট^২ + টড^২$ বা $হ = \sqrt{৭×৭ + ১.৫×১.৫ =}$ ৭.১৬ মিটার।

আমরা পারপেন্ডিকুলার উচ্চতা জেনে নিয়েছি। এবার চারটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করতে পারি। যথা:

চার ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল = ৪× (১/২×৭.১৬×৩) = ৪২.৯৬ স্কোয়ার মিটার ---- ২

এবার আমরা পিরামিডের পুরো সারফেস ক্ষেত্রফল উপরের ফলাফল ১ এবং ২ যোগ করে পেয়ে যাবো, যথা:

পিরামিডের ক্ষেত্রফল = ৯ + ৪২.৯৬ = **৫১.৯৬** স্কোয়ার মিটার।

এবার গোলকের ক্ষেত্রফল বের করতে হবে। আমরা জানি গোলকের সারফেস ক্ষেত্রফল $= ৪×\pi×র^২$ (এখানে π = ৩.১৪ এবং র হলো গোলকের ব্যাসার্ধ)। যেহেতু গোলকের ব্যাসার্ধ দেওয়া আছে ৩ মিটার তাই ক্ষেত্রফল হবে = ৪×৩.১৪×৩×৩ = **৩৭.৬৮** (লক্ষ করুন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে π (পাই) এর মান ৩.১৪ যথেষ্ট হবে)।

এবার উভয় সিলিন্ডারের ক্ষেত্রফল বের করতে হবে। আমরা জানি সিলিন্ডারের ক্ষেত্রফল = 2π×ক(ক+হ)। এখানে পাই = ৩.১৪, ক হলো বৃত্তের ব্যাসার্ধ ও হ হলো উচ্চতা। সুতরাং উভয় সিলিন্ডারের ক্ষেত্রফল হলো = ২×(২×৩.১৪×২.৫(২.৫+৭)) = ২৯৮.৩ স্কোয়ার মিটার। এখন দু'টি নিচের বৃত্তের ক্ষেত্রফল বাদ দিতে হবে। এই দুটি বৃত্তের ক্ষেত্রফল হলো = ২(πr^2) = ২(৩.১৪×২.৫×২.৫) = ৩৯.২৫ স্কোয়ার মিটার। সুতরাং সিলিন্ডারদ্বয় থেকে আমরা যে সারফেস ক্ষেত্রফল পেলাম তাহলো = ২৯৮.৩ - ৩৯.২৫ = **২৫৯.০৫** স্কোয়ার মিটার।

এখন বাকী রইলো বাক্স। এটা অতি সহজেই বের করা যায়, যথা : (৪(১১×৩.৫) + ২(৫×৩.৫)) - (৩৯.২৫) = (১৫৪ + ৩৫) - ৩৯.২৫ = **১৪৯.৭৫** স্কোয়ার মিটার। এখানে ৩৯.২৫ কেন বাদ দেওয়া হয়েছে তা নিশ্চয়ই পাঠকরা বুঝতে পেরেছেন।

আমরা এ পর্যায়ে এসে বলতে পারি যে বস্তুটির সারফেস ক্ষেত্রফল বের করে ফেলেছি। এই ফলাফলটি হলো: **৫১.৯৬ + ৩৭.৬৮ + ২৫৯.০৫ + ১৪৯.৭৫ = ৪৯৮.৪৪ মি^{২}।** আমার কালকুলেটর টিপতে যদি ভুল করে না থাকি তাহলে এই ফলাফল সঠিক।

আমাদের সমস্যার প্রথম অংশের সমাধান করেছি মাত্র! আমাদেরকে পুরো বস্তুটির ভলিউম বা ঘনফলও বের করতে হবে। তাহলে আসুন, এ কাজটিও সেরে নিই।

১. পিরামিডের ঘনফল = ১/৩×ব×ব×হ (এখানে ব হলো বেইজের পরিমাণ ও হ উচ্চতা) = ১/৩×৩×৩×৭ = ২১ কিউবিক মিটার।

২. একটি সিলিন্ডারের ঘনফল = পাই×ক^২×হ (এখানে পাই ৩.১৪, ক হলো ব্যাসার্ধ ও হ হলো উচ্চতা) = ৩.১৪×২.৫×২.৫×৭ = ১৩৭.৩৭৫ (একটির ঘনফল) সুতরাং ২টির ঘনফল = ১৩৭.৩৭৫×২ = ২৭৪.৭৫ কিউবিক মিটার।

৩. গোলকের ঘনফল = ৪/৩পাই×ক^২ = ৪/৩×৩.১৪×৩×৩ = ৩৭.৬৮ কিউবিক মিটার।

৪. বাক্সের ঘনফল = ১১×৫×৩.৫ = ১৯২.৫ কিউবিক মিটার।

আমরা দ্বিতীয় সমাধানও পেয়ে গেলাম। উপরোক্ত চারটি সংখ্যা যোগ করে নিলেই হলো: ২১+২৭৪.৭৫+৩৭.৬৮+১৯২.৫ = ৫২৫.৯৩ মি^{৩}।

সমাধান: পুরো বস্তুর সারফেস ক্ষেত্রফল = ৪৯৮.৪৪ মি^{২} এবং ঘনফল = ৫২৫.৯৩ মি^{৩}।

উপরের এই দু'টি উদাহরণ থেকেই শিক্ষার্থীরা ক্ষেত্রফল ও ঘনফল নির্ণয়ের পদ্ধতি সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা পেয়ে যাবেন- এটাই আশা।

৩.২ গতি ও ত্বরণ (Velocity & Acceleration)

গতিময়তা জাগতিক একটি মৌলিক উপাদান। আমরা সবাই গতি কী জিনিস মোটামুটি জানি। তবে গতি বা Velocity নিয়ে বিজ্ঞানের গবেষণার শেষ নেই। বিজ্ঞান গতিকে কিভাবে দেখে তার উপর এখন আমরা মৌলিক কিছু তথ্যাদি তুলে ধরছি। ব্যবহারিক গণিত দ্বারা গতিবিদ্যার উপর বিশেষ গবেষণাও হয়ে থাকে।

বিজ্ঞানের ভাষায়, **বিশেষ কোনো দিকে কোনো বস্তু চলন্ত হওয়ার রেইট বা সময়ের সঙ্গে চলার মাত্রাকে গতি বলে**। এ থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে যে গতির মূলত দু'টি উপকরণ আছে:

ক. বস্তু বিশেষ রেইটে চলন্ত হওয়া।
খ. বস্তুটি চলাকালে একটি নির্দিষ্ট দিকে চলা।
সুতরাং এরূপ গতিকে বলে ভেক্টর (Vector)।

গতির মাত্রা মূলত মিটার প্রতি সেকেন্ড হিসাবে বুঝানো হয়। যেমন: ২০০ মি/সে। সুতরাং অঙ্কে বলা যায়: **গতি গ = দূরত্ব দ / সময় স = গ = দ/স** মিটার/সেকেন্ড।
ইংরেজিতে: v = d/t (m/s) ----- এখানে v = velocity, d = distance travelled and t = time taken।

গতি যতক্ষণ পর্যন্ত সমান থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত এটা উপরোক্ত সমীকরণের আওতাভুক্ত থাকবে- কিন্তু গতিও পরিবর্তনশীল হতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে গতির নাম হবে ত্বরণ (Acceleration)। সুতরাং ত্বরণ অর্থ হলো গতির পরিবর্তন রেইট যা মিটার / সেকেন্ড^২ দ্বারা পরিমাপ হয়। আমরা যদি ত্বরণকে ত দ্বারা, গতিকে গ দ্বারা এবং সময়কে স দ্বারা সম্বোধন করি, তাহলে ত্বরণের সমীকরণ হবে:

ত = গতি গ / টাইম স। ইংরেজিতে: $a = v/t$ (m/s^2)।

লক্ষ করুন, গতি যেহেতু মিটার / সেকেন্ড সুতরাং ত্বরণের ইউনিট হবে মিটার / সেকেন্ড×সেকেন্ড।

৩.২.১ বলবিদ্যায় ব্যবহারিক গণিত (Applied Mathematics in Mechanics)

বলবিদ্যায় ব্যবহারিক গণিতের গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা বেশী। আমরা ইতোমধ্যে বলবিদ্যার দু'টি মৌলিক বিষয়- গতি ও ত্বরণ সম্পর্কে বলেছি। বলবিদ্যা সম্পর্কে আরো জানতে হলে এটার সাথে ব্যবহারিক গণিতের সম্পর্ক কী তা জানতে হবে।

ত্বরণ ও গতি ছাড়াও আধুনিক যুগে আরো ক'টি বিষয় বলবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত করে গবেষণা করা হয়। এগুলো হলো:

১. কোনো বস্তুর ভ্রমণ-দূরত্ব (distance travelled)।

২. সময় (time)।

৩. ওজন (mass)।

৪. বস্তুর উপর ক্রিয়াশীল বলসমূহ (forces acting on the body)।

আজ থেকে তিন শতাধিক বছর পূর্বে ইংরেজ গাণিতিক আইজাক নিউটন গতিবিদ্যার উপর কিছু মৌলিক থিওরী প্রতিষ্ঠা করেন। বিংশ শতক পর্যন্ত তার এসব থিওরীই ছিলো গতিবিদ্যার ভিত্তি। বাস্তবে এসব থিওরী আজো সাধারণ ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য। আর আমরা এখানে এসব থিওরীর উপরই গাণিতিক আলোচনা করবো। তবে বলে রাখা অত্যাবশ্যক যে, নিউটনের থিওরী বা আইনগুলো আলোকের গতির সঙ্গে তুলনামূলক উচ্চ গতিশীল বস্তুর ক্ষেত্রে অকেজো হয়ে পড়ে। সে ক্ষেত্রে প্রয়োজন দাঁড়ায় আলবার্ট আইনস্টাইন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত থিওরী রিলেটিভিটি (Relativity) বা আপেক্ষিকতাবাদের। এখানেই শেষ নয়, নিউটনের থিওরী অণু-পরমাণুর জগতেও

অকেজো। সেখানে গিয়ে যে থিওরী কার্যকরী হয় তাহলো, ক্যুয়ান্টাম মেকানিক্স [quantum mechanics]।

প্রথমেই আমাদেরকে ভ্রমণের দূরত্ব, সময় ও গতির মধ্যে সম্পর্ক কি তা জেনে নিতে হবে। কোনো বস্তুর চলার গতি যদি অপরিবর্তিত থাকে তাহলে এই সম্পর্ক নিম্নের সমীকরণ দ্বারা বুঝানো যায়:

$$d = vt \text{ (meter)---- (1)}$$

এখানে d হলো যেটুকু দূরত্বে ভ্রমণ করেছে, v হলো বস্তুর গতি বা ভেলোসিটি এবং t হচ্ছে সময়।

দৃষ্টান্ত: মনে করুন একটি গাড়ির গতি ৯০ কিমি/ঘণ্টা, ৪০ মিনিট ভ্রমণ শেষে গাড়িটি কতটুকু দূরত্বে গিয়ে পৌঁছবে?

উপরের সমীকরণ থেকে আমরা বলতে পারি দূরত্ব = (৯০/৬০)×৪০ = ৬০ কিমি (উঃ)। লক্ষ করুন, যেহেতু এখানে ঘণ্টার হিসাব দেওয়া আছে তাই প্রথমে প্রতি মিনিটে গতির পরিমাণ বের করতে হয়েছে।

কোনো বস্তুর ত্বরণ যতি অপরিবর্তিত থাকে তাহলে নিম্নের সমীকরণদ্বয় প্রযোজ্য হবে:

$$v=at \text{ --- (2)}$$

$$d=1/2\times at^2 \text{ --- (3)}$$

এখানে d হলো যেটুকু দূরত্বে ভ্রমণ করেছে, v হলো বস্তুর গতি বা ভেলোসিটি, a হলো ত্বরণ এবং t হচ্ছে সময়। উপরের তিনটি সমীকরণ তথা (১), (২) ও (৩) শিক্ষার্থীদের জন্য মুখস্ত করা জরুরী।

৩.২.২ মহাকর্ষজণিত ত্বরণ (Acceleration due to gravity)

একটি ভারী বস্তু যদি (বাতাসসৃষ্ট বিপরীত গতি থেকে) মুক্ত অবস্থায় উপর থেকে মাটির দিকে পতিত হয় তাহলে বস্তুর উপর একটি অপরিবর্তীত ত্বরণ বিদ্যমান থাকবে। এই ত্বরণকে বলে "**মহাকর্ষজণিত ত্বরণ**" (**Acceleration due to gravity**)। পীরক্ষা করে দেখা গেছে এই ত্বরণের মাত্রা হলো ৯.৮১ মিটার/সেকেন্ড×সেকেন্ড। তাহলে বুঝতে হবে বস্তুটি পড়ার সময় প্রথম সেকেণ্ড বাদে এর গতি হবে ১×৯.৮১ =

৯.৮১ মিটার/সেকেন্ড। তখন এটা ৪.৯ মিটার দূরত্বে পতিত হবে। দ্বিতীয় সেকেন্ড পরে এর গতি হবে ২×৯.৮১ = ১৯.৬১ মিটার/সেকেন্ড। ততক্ষণে বস্তুটি ৯.৮ মিটার দূরত্বে পড়ে যাবে।

৩.২.৩ চক্রাকার গতি (Circular motion)

এটাও আরেকটি সাধারণ গতি। যদি কোনো বস্তুর মধ্যে অপরিবর্তীত গতি থাকে এবং তার ত্বরণ সবসময় ভেলোসিটি থেকে সমকোণ (right angle to its velocity) হয় তাহলে বস্তুটি বৃত্তাকারে চলবে। এক্ষেত্রে ত্বরণ সবসময় বৃত্তের কেন্দ্রের দিকে ধাবিত থাকবে যাকে বলে "**কেন্দ্রধাবিত ত্বরণ**" (**Centripetal acceleration**)। সুতরাং কোনো বস্তু যখন v গতিতে কোনো বৃত্তের উপর চলবে যার ব্যাসার্ধ r, তখন কেন্দ্রধাবিত ত্বরণ a হবে:

$$a = v^2/r \ldots(১)$$

দৃষ্টান্ত: একটি বল ৫মি ব্যাসার্ধবিশিষ্ট একটি বৃত্তের উপর চলন্ত আছে। বলটির গতি হলো ৩ মিটার / সেকেন্ড। এর কেন্দ্রধাবিত ত্বরণ কি হবে?

উঃ উপরের সমীকরণ ১ থেকে: $a = v^2 / r$ = ৩×৩/৫ = ৯/৫ = ১.৮ মি/সেকেন্ড×সেকেন্ড।

৩.২.৪ দিকগতি (Vectors)

যেসব বস্তু গতিশীল বস্তুর মধ্যে গতির মাত্রা ও দিক এই উভয়বিদ মান বিদ্যমান, তাকে দিকগতি বা ভেক্টর বলে। আমরা নতুন বাংলা শব্দ 'দিকগতি' ব্যবহার না করে আপাতত ইংরেজি ভেক্টর শব্দটিই কাজে লাগাবো। ভেক্টর নয় এমক কোনো পরিমাপকে বলে স্কেলার। দৃষ্টান্ত হিসাবে আমরা বলতে পারি ২৫ কিলোমিটর- এটা একটি পরিমাপ কিন্তু অন্য কোনো তথ্য এতে নেই- সুতরাং এটা স্কেলার পরিমাপ। এখন যদি বলি ২৫ কি.মি. উত্তর দিকে তখন অতিরিক্ত একটা তথ্য আমরা পেলাম- ফলে পরিমাপটি ভেক্টর হিসাবে ধরা যাবে। অঙ্কে ভেক্টরের ব্যবহার খুব বেশী হয়ে থাকে। এর কারণ হলো, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফলাফল স্কেল চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমেই বের করা সম্ভব। একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটি বুঝানো সহজ হবে।

মনে করো একখানা নৌকা নদী পাড়ি দিয়ে ওপারে যাচ্ছে। চিত্র দ্বারা এই নৌকোর গতির একটি স্কেল ড্রইং দেখানো যাবে (নিচের নক্সাটি দেখো)। নৌকোখানা স থেকে ক-এ যেতে পাড়ি জমিয়েছে। কিন্তু যেহেতু নদীর পানিতে স্রোত থাকে তাই এটা সোজা ওপারে যেতে অপারগ। আমরা স থেকে ক (বাহু চ) ও ক থেকে খ (বাহু ছ) এর দূরত্ব স্কেল চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে তুলে ধরলে স থেকে খ (বাহু জ) এর একটি হিসাব পাবো।
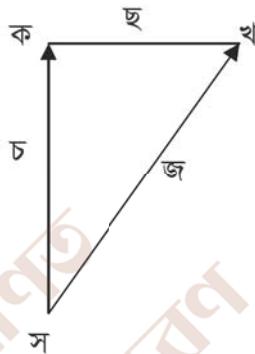
বাস্তরে বাহু জ-ই হলো নৌকোটি চলার আসল দিক। এবার যদি আমরা বাহু জ মেপে নিই তাহলে এ থেকেই নৌকার গতি নির্ণয় করতে সক্ষম হবো। মনে করো নদীটি এপার থেকে ওপারে ৫০ মিটার, এর স্রোত ১.৫ মিটার প্রতি সেকেন্ড। নৌকার গতি ২.৫ মিটার প্রতি সেকেন্ড। এ হিসাবে ৫০ মিটার অতিক্রম করতে লাগবে ৫০/২.৫ = ২০ সেকেন্ড। এই সময়ের মধ্যে পানি অতিক্রম করবে ২০×১.৫ = ৩০ মিটার। আমরা চিত্রাঙ্কনের সময় ৫মিমি = ১ মিটার বলবো। এই স্কেলে ৫০ মিটার = ২৫০মিমি বা ২৫ সেমি এবং ৩০ মিটার = ১৫০ মিমি বা ১৫ সেমি। সুতরাং লাইন চ = ২৫০মিমি ও লাইন ছ = ১৫০মিমি হবে। দু'টি উপায়ে নৌকার গতি ও দিক নির্ণয় করে নিতে পারি। প্রথমত স্কেল চিত্র থেকেই মেপে এই উভয় ফলাফল বের করা যায়- যা আসলটির প্রায় কাছাকাছিই হবে যদি আমাদের চিত্রটি খুব বেশী সঠিক হয়। অঙ্ক কষেও তা বের করা সম্ভব। মনে আছে পিথাগোরাজ থিওরেম?

$$\text{বাহু জ}\times\text{জ} = \text{বাহু চ}\times\text{চ} + \text{বাহু ছ}\times\text{ছ}$$

সুতরাং জ = $\sqrt{৫০\times৫০ + ৩০\times৩০}$ = ৫৮.৩১ মিটার। যেহেতু নৌকাটি বাস্তবে এটুকু রাস্তা পাড়ি দেবে তাই সময়ও একটু বেশী অতিবাহিত হবে। গতি = ১.৫

মিটার/সেকেন্ড। সুতরাং নৌকাটি ওপারে যেতে লাগবে ৫৮.৩১/২.৫ = ২৩.৩২ সেকেন্ড।

ভেক্টক ব্যবহার দ্বারা গতিবিদ্যার অনেক ফলাফল বের করা যায় আর এজন্য অঙ্ক কষা মোটেই জরুরী নয় বরং সঠিক স্কেলে চিত্রাঙ্কন করলেই সারে। আমরা এই গ্রন্থে ভেক্টর অ্যানালিসিস নামক উচ্চতর গাণিতিক গবেষণায় যাবো না। বাস্তবে তা হবে বইটির স্কোপের বাইরে। তবে মনে রাখার ব্যাপার হলো ভেক্টর মূলত দু'টি পরিমাপের সমন্বয়ে হয়- একটির নাম গতির পরিমাণ ও অপরটি গতির দিক।

৩.২.৫ ঘুর্নণগতি (Torque)

যে কোনো বস্তুকে তার নিজস্ব ঘুর্নন শলাকার (Axis of rotation) উপর ঘুরানো সম্ভব। এই গতির নামই হলো ঘুর্ননগতি বা টর্ক। টর্কের মাত্রা নিম্নলিখিত সমীকরণ দ্বারা বের করা যায়।

$$t = f \times d$$

এখানে f হলো যে ফোর্স দ্বারা ঘুরানো হবে তার মাত্রা এবং d হলো বস্তুর ঘুর্নন শলাকা থেকে যেটুকু দূরত্বে ফোর্স করা হবে তার পরিমাপ।

দৃষ্টান্ত: একটি লোহার বড় চাকার ব্যাসার্ধ ২.৫ মিটার। এটিকে ঘুরানোর জন্য ১০ নিউটন ফোর্স চাকার রীমে প্রয়োগ করতে হবে। চাকার টর্ক কি হবে?

উপরের সমীকরণ থেকে টর্ক = ১০×২.৫ = ২৫ নিমি (নিউটন মিটার)।

৩.২.৬ নিউটনের গতি আইন (Newton's Laws of motion)

ইংরেজ বিজ্ঞানী আইজাক নিউটন গতিবিদ্যার উপর গবেষণা শেষে তিনটি গতি আইন প্রকাশ করেন। এই আইনত্রয় সাধারণ কোনো বস্তুর গতিবিধি জানতে কাজে লাগানো যায়। তবে আলোকের কাছাকাছি গতি কিংবা পারমাণবিক ক্ষেত্রে এসব আইন অকেজো। আমরা যেহেতু সাধারণ বস্তু ও গতির উপর আলোচনা করছি তাই এই আইনগুলো জেনে নেওয়া দরকার।

প্রথম আইন : যে কোনো বস্তু সর্বদাই স্থির কিংবা অপরিবর্তিত গতির অবস্থায় থাকে যদি না অন্য কোনো গতি এর উপর ক্রিয়া করে।

দ্বিতীয় আইন : কোনো বস্তুর অপরিবর্তনীয় গতি যদি সময়ের ব্যবধানে বাড়তে থাকে তাহলে এই গতিকে বলে ত্বরণ। যে ফোর্স বা গতির মাধ্যমে বস্তুটিকে ত্বরণশীল করা যায় তা মূলত নিম্নের সমীকরণ থেকে পাওয়া যাবে।

ফোর্স (F) = ম্যাস (m) × ত্বরণ (a)

উপরের সমীকরণে ম্যাস হবে কিলোগ্রাম ইউনিটে, ত্বরণ হবে মিটার/সেকেন্ড×সেকেন্ড এবং ফোর্স হবে নিউটন (এন) ইউনিটে।

কোনো বস্তুর মধ্যে যদি ফ্রিকশন্যাল ফোর্স (কোনো বস্তু সরাতে বস্তুটি ও যেখানে তা বসা আছে তার মধ্যে বিপরিত দিকের শক্তিকে বলে ফ্রিকশন্যাল ফোর্স) থাকে তাহলে উপরোক্ত সমীকরণ কিছুটা পাল্টিয়ে লিখতে হবে:

ইফেক্টিভ ফোর্স (F) - ফ্রিকশন্যাল ফোর্স (f) = ম্যাস (m) × ত্বরণ (a)

উভয় ফোর্সের পার্থক্য দ্বারা আমরা নেট ফোর্স বের করেছি মাত্র। অধিকাংশ বস্তুর মধ্যে (বাতাসে ও পানিতে চলমান অবস্থায়) যে ফ্রিকশন্যাল ফোর্স ক্রিয়া করে তাহলো = $kv^২$ এখানে k হলো একটি অপরিবর্তনশীল নাম্বার যা নির্ভর করে বস্তুটি কোন্ বস্তুর উপর দিয়ে চলমান আছে। আর v হলো বস্তুর ভেলোসিটি। সুতরাং নিউটনের দ্বিতীয় আইন ফ্রিকশন্যাল ফোর্স থাকলে লিখা যায় এভাবে:

$$F - kv^২ = m \times a$$

তৃতীয় আইন : প্রত্যেক ক্রিয়ার মধ্যে সর্বদাই সমপরিমাণ বিপরীত ক্রিয়া থাকে। সুতরাং কেউ যদি আঙ্গুল দ্বারা একটি বড় পাথরকে সরাতে ধাক্কা দেয় তাহলে পাথরটিও আঙ্গুলের মধ্যে সমপরিমাণ শক্তি দ্বারা ধাক্কা দেবে।

চতুর্থ অধ্যায়

বস্তুবিদ্যায় ব্যবহারিক গণিত

পুরো মহাবিশ্ব বিভিন্ন বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত। এসব বস্তুকে বুঝা, তাদের মৌলিক গুণাবলী সম্পর্কে জানা এবং এগুলোর সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে উপযোগী কিছু তৈরী করা ইত্যাদি কাজই হলো বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির আওতাভুক্ত বিষয়াদি। বস্তুর উপর গবেষণায় গণিতের ব্যবহার অপরিহার্য। সুতরাং বস্তুবিদ্যার ক্ষেত্রে ব্যবহারিক গণিতের স্বরূপ ও বিভিন্ন উপায়-উপকরণের উপর আলোচনাই হবে আমাদের এই অধ্যায়ের বিষয়-বস্তু।

৪.১ বস্তুর ঘনত্ব (Density)

একটি বিশেষ ক্ষেত্রের মধ্যে কতটুকু পদার্থ আছে তার হিসাবকে বলে ঘনত্ব বা ডেনসিটি। পদার্থ বিজ্ঞানে ঘনত্ব হলো ম্যাস ও ভলিউমের সঙ্গে সম্পৃক্ত। যথা:

ঘনত্ব (D) = ম্যাস (m) / ভলিউম (v) --- ১

সাধারণত ম্যাস হবে গ্রাম ইউনিটে এবং ভলিউম হবে কিউবিক সেন্টিমিটারে। সমীকরণ ১ ব্যবহার করে আমরা যে কোনো বস্তুর ঘনাঙ্ক বের করতে পারি। অবশ্য বস্তুর ম্যাস ও ভলিউম জানতে হবে। অপরদিকে ঘনাঙ্ক ও ভলিউম জানলে ম্যাস পাওয়া যাবে এবং ঘনাঙ্ক ও ম্যাস জানলে ভলিউমও পাওয়া যাবে।

দৃষ্টান্ত: ১. এ্যলুমিনিয়ামের ঘনাঙ্ক হলো ২,৭০০ কিগ্রা/কিউবিক মিটার। একখণ্ড এ্যলুমিনিয়ামের ম্যাস যদি ২০০ কিলোগ্রাম হয় তাহলে এর ভলিউম কি হবে?

উ: আমরা উপরের সমীকরণকে একটু পাল্টিয়ে এভাবে লিখতে পারি: **v = m/D**
সুতরাং ভলিউম = ২০০/২৭০০ = ০.০৭৪ কিউবিক মিটার।

২. পানির ঘনাঙ্ক হলো ১০০০ কিগ্রা/কিউবিক মিটার। ৫ কিউবিক মিটার পানির ম্যাস কি হবে?

উ: আমরা সমীকরণ ১-কে এভাবেও লিখতে পারি: **m = D×v**

সুতরাং পানির ম্যাস হবে = ১০০০×৫ = ৫০০০ কিগ্রা।

৩. হাইড্রোজেন গ্যাসের ঘনাঙ্ক ০.০৯ কিগ্রা/কিউবিক মিটার। একটি পাত্রে ২ কিউবিক মিটার হাইড্রোজেন আছে। এর ম্যাস বের করো।
উ: ম্যাস = ০.০৯×২ = ০.১৮ কিগ্রা।

উপরের আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয়েছে, যে কোনো বস্তুর ঘনাঙ্ক সর্বদাই অপরিবর্তনশীল একটি রাশি। সুতরাং বস্তুর ওজন ও ভলিউম জেনে নিতে আমরা ঐ ঘনাঙ্ককে কাজে লাগাতে পারি। লক্ষ করার বিষয় যে, বস্তুর তিনটি গুণাগুণ আমরা উপরোক্ত সমীকরণ ১ থেকে জানতে পারি।

৪.২ তরল পদার্থ ও গ্যাস (liquids & gases)

স্বাভাবিকভাবে সব বস্তু তিনটি অবস্থার যে কোনো একটির মধ্যে থেকে অস্তিত্বশীল থাকে। এই তিনটি অবস্থার নাম হলো: ১. কঠিন পদার্থ, ২. তরল পদার্থ ও ৩. গ্যাস বা বাস্প। নিচের ছবিতে এই তিন অবস্থার একটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

আমরা ইতোমধ্যে কঠিন পদার্থ নিয়ে বেশ কিছু আলোচনা ও অঙ্ক কষেছি। এবার আমরা তরল ও গ্যাসের উপর কিছু তথ্যাদি ও হিসাব নিকাশের দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করছি। নিচের ছবি থেকে এটা সহজেই অনুমেয় যে, বস্তুর অবস্থা নির্ভর করে তার তাপমাত্রার
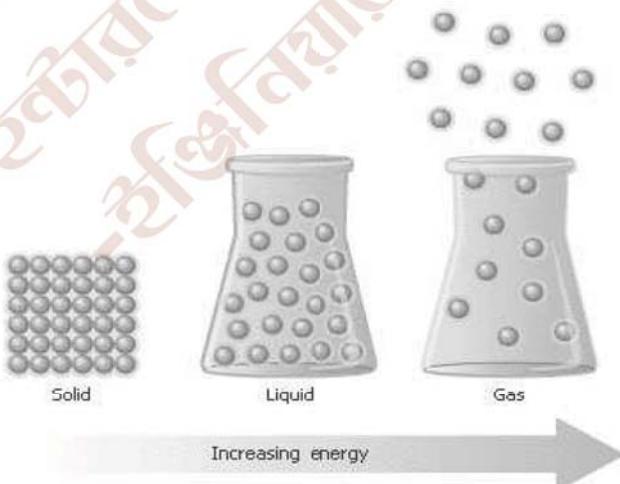
উপর। আর তাপমাত্রা হলো এক ধরনের এনার্জি বা শক্তি। বস্তুর তাপমাত্রা যতো বাড়ানো হবে তার অভ্যন্তরস্থ মলিকিউল বা ক্ষুদ্র অংশগুলো একটা আরেকটি থেকে ক্রমান্বয়ে দূরে সরে পড়ে। একটি বিশেষ পরিমাণ এনার্জি পেলে বস্তুটি কঠিন থেকে তরলে রূপান্তর হয়। এরপর আরো এক পর্যায়ে এসে তা গ্যাস হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

৪.২.১ তরল পদার্থ

প্রত্যেক তরল পদার্থের মধ্যে কয়েকটি বিশেষ গুণাবলী আছে যেগুলো আমাদের জন্য জানা জরুরী। এসব গুণাবলী হলোঃ ১. ফুটনাঙ্ক [boiling point], ২. হিমাঙ্ক [freezing point], ৩. ভিসকোসিটি বা সান্দ্রতা [viscosity], ৪. সারফেস টেনশন বা পৃষ্ঠদেশ প্রসারণ [surface tension], ৫. ক্যাপিলারী এ্যকশন বা কৈশিক নালীক্রিয়া [capillary action] ও ৬. মিসসিবিলিটি বা মিশ্রণযোগ্যতা [miscibility]।

১. ফুটনাঙ্ক : কোনো তরল পদার্থ যে তাপমাত্রায় তরল থেকে গ্যাসে পরিণত হয় তাকেই বলে পদার্থের ফুটনাঙ্ক। এ সময় তরল পদার্থটি ফুটতে থাকে। সাগর লেবেলে ১ গ্রাম পরিমাণ পানি গ্যাসে পরিণত হতে তাপমাত্রা লাগে ১০০ ডিগ্রী সেলসিয়াস ও এতে মোট এনার্জি খরচ হয় ২২৬০ জুলস। সুতরাং পানির ফুটনাঙ্ক হলো ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

২. হিমাঙ্ক : কোনো তরল পদার্থ যে তাপমাত্রায় তরল থেকে কঠিন পদার্থে রূপান্তর হয় তাকে বলে পদার্থের হিমাঙ্ক বা ফ্রিজিং পয়েন্ট। এই তাপমাত্রায় পদার্থের মলিকিউলগুলো অনেকটা টাইট-ফিট হয়ে পড়ে। অথচ তরল অবস্থায় তা ছিলো বেশ ফ্রি। অধিকাংশ তরল পদার্থ যখন হিমাঙ্কে পৌঁছে তখন তার ঘনত্ব প্রায় ১০% কমে যায়। আর এই কমে যাওয়ার কারণই হলো মলিকিউলগুলো আঁটসাট হওয়া। পানির হিমাঙ্ক হলো ০ ডিগ্রী সেলসিয়াস।

৩. ভিসকোসিটি : এই শব্দটির বাংলা "সান্দ্রতা" বলা চলে। এটা মূলত তরল পদার্থের মধ্যে প্রবহমান হওয়ার বিপরীত ক্রিয়ার একটি মাপ। সুতরাং যে পদর্থে ভিসকোসিটি যতো কম হবে তার প্রবহমান মাত্রা ততো বেশী হবে। প্রবহমান হওয়ার ফলেই

অধিকাংশ তরল পদার্থ তার পাত্রের আকার ধরাণ করে থাকে। ভারী তৈল থেকে পানির ভিসকোসিটি অনেক কম। তবে ভিসকোসিটিও তাপমাত্রা বাড়লে কমে আসে।

৪. সারফেস টেনশন : বস্তুর বহির্ভাগকে বলে সারফেস। বহির্ভাগের মলিকিউগুলো তিনদিকে অন্যান্য মলিকিউলের সঙ্গে সংযুক্ত থাকলেও উপরের দিকে এই সম্পৃক্ততা থাকে না। এর ফলেই মূলত সারফেস টেনশনের সৃষ্টি হয়। সারফেস টেনশেনর ফলেই পানির ফোটা গোলাকার অবস্থায় থাকে- মনে হয় যেনো একটি অদৃশ্য চামড়া দ্বারা তা আবৃত আছে। সারফেস টেনশন দেখা যায় পুকুরে যখন ছোট্ট ছোট্ট মাকড়শা দৌড় দেয়। এরা পানির ভেতর ডুবে যায় না এই সারফেস টেনশনের ফলে।

৫. ক্যাপিলারী এ্যাকশন : এই ক্রিয়ার ফলে টিস্যু কাগজ পানিতে রাখলে পানি উপরের দিকে বেয়ে ওঠে। এছাড়া একটি কাচের টিউব পানিতে রাখলে কিছুটা পানি টিউব বেয়ে

ক্যাপিলারী ক্রিয়া

উপরে উঠে যায় এই ক্যাপিলারী ক্রিয়ার ফলে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে তরল পদার্থ কিছু কিছু বস্তুর প্রতি নিজের তুলনায় আকর্ষণীয়- অর্থাৎ নিজস্ব মলিকিউলের প্রতি আকর্ষণ থেকে অন্য কোনো বস্তুর প্রতি আকর্ষণ বেশী। যেমন পানি কাচের প্রতি বেশী আকর্ষণ করে ফলে টিউবের উপর দিয়ে বেয়ে ওঠে। অপরদিকে পারদ কাচের তুলনায় নিজেদের প্রতি আকর্ষণ বেশী করে তাই কাচের টিউব পারদে ঢুকালে পারদ অনেকটা নিচের দিকে নেমে যায় (দেখুন উপরের চিত্রটি)।

৬. মিসিবিলিটি : বিভিন্ন তরল পদার্থ কতটুকু মিশে যায় সে হিসাবকে বলে পদার্থের মিসিবিলিটি। প্রত্যেক তরল পদার্থের মলিকিউলগুলো একেক বিশেষ আঙ্গিকে জড়িত থাকে। এর একটি হলো পলারিটি। পলারিটি অর্থ হলো ভিন্ন মলিকিউল একটা আরেকটাকে ধণাত্মক ও ঋণাত্মক হওয়ার ফলে খুব শক্তভাবে আকর্ষণ করে। যেমন অক্সিজেন এটম ও হাইড্রোজেন এটমের মধ্যে পলারিটি বিদ্যমান থাকায় পানির মলিকিউলের মধ্যে শক্ত আকর্ষণ আছে- আর পানি মূল অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের সমন্বয়ে গঠিত। তবে কিছু কিছু তরল বস্তু আছে যাদের মলিকিউলগুলোর মধ্যে শক্ত পলারিটি না থাকায় অন্য বস্তুর সঙ্গে সহজে মিশে না। সাধারণত উভয় পদার্থে শক্ত পলারিটি থাকলে তা মিশে যাবে- কিন্তু একটি পলার ও অপরপি নন-পলার হলে মিশবে না। এসব কারণেই এ্যলকাহল ও পানি মিশে যায়, কারণ উভয়টি পলার বস্তু। অপরদিকে পানির সঙ্গে তৈল মিশবে না কারণ, পানি পলার হলেও তৈল পলার নয়।

৪.২.২ গ্যাস

আমরা ইতোমধ্যে তরল পদার্থ সম্পর্কে আলোচনায় বলেছি যে, এর ক্ষুদ্র অংশ মলিকিউলগুলো একটা আরেকটা থেকে কিছু দূরে অবস্থান করে। এর ফলে তরল পদার্থ যে পাত্রে রাখা হবে সে পাত্রের আকার ধারণ করবে। গ্যাসের ক্ষেত্রে মলিকিউলের দূরত্ব আরো বেশী, বরং একটা আরেকটার মধ্যে আকর্ষণ ক্ষমতা খুব দূর্বল। সুতরাং গ্যাস কোনো পাত্রে অবস্থান করলে পুরো পাত্রব্যাপী ছড়িয়ে পড়বে। গ্যাসের অনেক বৈশিষ্ট্য আছে। যেমন, কোনো কোনো গ্যাস কাচের মতো সম্পূর্ণ পরিষ্কার (ট্রান্সপেরেন্ট), কোনোটার মধ্যে আছে শক্ত গন্ধ আবার কোনোটাতে নেই। গ্যাস সাধারণত পানিতে গলে না তবে এক দু'টু ছাড়া। কিছু কিছু গ্যাস আছে যেগুলো অন্য বস্তুর সঙ্গে মিশলে বিস্ফোরণ ঘটায়। গ্যাসের রসায়নিক কাঠামোও অনেক ধরনের হয়ে থাকে।

৪.২.৩ গ্যাস আইনসমূহ

পাঁচটি আইন বা সমীকরণ দ্বারা গ্যাসের উপর গবেষণা হয়। এগুলো হলো: ১. বয়েলস আইন (Boyle's law), ২. চার্লস আইন (Charles's law), ৩. ডালটন আইন (Dalton's law), ৪. এভোগার্ডো আইন (Avogadro's law) এবং ৫. একীভুত আদর্শ গ্যাস সমীকরণ (combined ideal gas equation)। আমরা একে একে এগুলোর ব্যাখ্যা তুলে ধরবো।

১. বয়েলস আইন : কোনো গ্যাসকে আমরা যখন চাপের মাধ্যমে ছোট্ট পাত্রে ভরে রাখার চেষ্টা চালাই তখন এটা পাত্রের দেয়ালেও ক্রমান্বয়ে বেশী থেকে বেশী চাপ সৃষ্টি করবে। অর্থাৎ গ্যাসের ঘনফল যতো কমবে পাত্রের দেওয়ালে চাপ ততো বাড়বে। বয়েলস আইন দ্বারা এই ক্রিয়ার একটি গাণিতিক ব্যাখ্যা করা যায়। এই আইন আমাদেরকে বলে দিচ্ছে যে, **"অপরিবর্তিত তাপমাত্রায়, গ্যাসের ভলিউম চাপের সঙ্গে বিপরীতভাবে আনুপাতিক"**। গাণিতিকভাবে এই আইনকে আমরা লিখতে পারি:

$$V = k(1/p) \ldots \ldots ১$$

এখানে V হলো ভলিউম, k হলো বলজ্‌ম্যান্স রাশি (যার মান = ১.৩৮ x ১০$^{-২৩}$) এবং p হলো চাপ বা প্রেশার। এই আইন এটাই বলছে যে, তাপমাত্রা সমান রেখে যদি গ্যাসের চাপ বাড়িয়ে দ্বিগুণ করা হয় তাহলে এর ভলিউম আগের তুলনায় অর্ধেকে নেমে আসবে। অপরদিকে যদি চাপের মাত্রা অর্ধেক করা হয় তাহলে ভলিউম বৃদ্ধি পেয়ে আগের তুলনায় দ্বিগুণ হবে।

২. চার্লস আইন : পরীক্ষা করে দেখা গেছে প্রেশার অপরিবর্তিত রেখে গ্যাসের তাপমাত্রা বাড়ালে তার ভলিউম বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধি পাওয়া, চাপ ও তাপমাত্রার মধ্যে একটি বিশেষ সম্পর্ক আছে। চার্লস আইন এই সম্পর্ককে বুঝিয়ে দিয়েছে: **"অপরিবর্তিত চাপে, গ্যাসের ভলিউম কেলভিন স্কেলে তাপমাত্রার সঙ্গে সরাসরি আনুপাতিক"**। গাণিতিকভাবে বলা যায়:

$$V = kt \ldots \ldots ২$$

এখানে V হলো ভলিউম, t হলো একটি অপরিবর্তনশীল রাশি এবং k হলো কেলভিন স্কেলে তাপমাত্রা। এই আইন থেকে এটাই বুঝা যায় যে, গ্যাসের তাপমাত্রা দ্বিগুণ করলে এর ভলিউমও দ্বিগুণ হবে (যতক্ষণ চাপমাত্রা সমান থাকবে)।

৩. ডালটন আইন : এই আইনে বলা হয়েছে: **"একাধিক গ্যাসের মিশ্রণে যে চাপ থাকে তা মূলত একক সকল গ্যাসের চাপের যোগফল"**। গাণিতিকভাবে বলা যায়:

$$P_t = P_1 + P_2 + P_3 + \ldots \ldots ৩$$

দৃষ্টান্ত হিসাবে বায়ুমণ্ডলের বাতাসের কথা বলা যেতে পারে। বাতাসে আছে নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, আরগন, বাস্প ও কার্বন-ডাইওক্সাইড। বাতাসের মধ্যে যে চাপ আছে তা মূলত বায়ুমণ্ডল থেকেই আসে। বাতাসের মোট চাপের ৭৮% চাপ পড়ে নাইট্রোজেনে, অক্সিজেনে ২১% ও ০.৯% আছে আরগনে। এই তিনটি গ্যাস মিলেই বাতাসের মধ্যকার ৯৯.৯% চাপ হয়েছে। বাস্প, কার্বন ডাইওক্সাইড এবং অন্যান্য যাবতীয় ক্ষুদ্রাংশ মিলে মাত্র ১ পার্সেন্টের ১০ ভাগের এক ভাগ পরিমাণ চাপ হয়েছে।

৪. এভোগার্ডো আইন : এই আইন বলে: "**একই ধরনের তাপ ও চাপে সকল গ্যাসের ক্ষেত্রে সমপরিমাণ ভলিউমের মধ্যে সমপরিমাণ পার্টিকেল (অণু ও মলিকিউল) থাকবে**"। শূন্য (০) ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড (বা ৩২ ডিগ্রী ফারেনহাইটে) এবং সাগর লেবেলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপকে বলে স্টেন্ডার্ড টেমপারেচার এন্ড প্রেশার (STP)। সুতরাং এভোগার্ডো আইনানুযায়ী এসটিপি অবস্থায় ১ কিউবিক মিটার অক্সিজেন এবং এসটিপি অবস্থায় ১ কিউবিক মিটার নাইট্রোজেনে সমপরিমাণ পার্টিকেল থাকবে। এভোগার্ডো আইনকে তাই অন্যভাবে বলা যায়: ১ মৌল পরিমাণ যে কোনো গ্যাস এসটিপি অবস্থায় ২২.৪ লিটার ভলিউম ধারণ করবে। ১ মৌল = ৬.০২ × ১০^{২৩} পরিমাণ মৌলিক পার্টিকেল। এই বিরাট বড় সংখ্যাকে বলে এভোগার্ডোজ নাম্বার।

৫. একীভুত আদর্শ গ্যাস সমীকরণ : উপরে বর্ণিত সকল গ্যাস আইনকে একক সমীকরণের মাধ্যমে একীভুত করা সম্ভব। এই সমীকরণ হলো:

$$PV = nRT \quad \ldots\ldots \text{৪}$$

এখানে P অর্থ চাপ, V হলো ভলিউম, n হলো গ্যাসের মৌল নাম্বার, R একটি বিশ্বজনীন অপরির্তনশীল রাশি যার মান হলো ০.০৮২১ এবং T হলো তাপমাত্রা।

৪.২.৩ বস্তুর তিন অবস্থা ও পর্যায় ক্রান্তি (Three states of matter & phase transition)

সকল বস্তু এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় পরিবর্তিত হতে পারে। এই পরিবর্তন সংঘটিত হয় বস্তুর মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণ এনার্জি রদবদলের মাধ্যমে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এনার্জি মূলত তাপমাত্রাই হয়ে থাকে। তবে গ্যাসকে চাপের মাধ্যমেও পরিবর্তিত অবস্থায় রূপান্তর সম্ভব। এই চাপও কিন্তু একটি এনার্জি মাত্র।

বস্তুর তিন অবস্থা ও পর্যায় ক্রান্তি
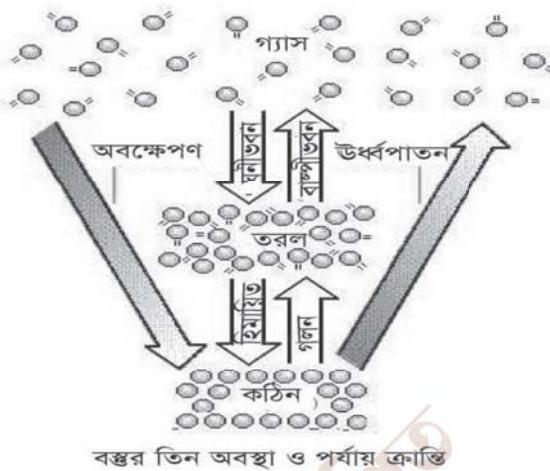
পাশের চিত্রটির প্রতি দৃষ্টিপাত করে আমরা দেখতে পাচ্ছি কোন্ কোন্ উপায়ে বস্তুর পর্যায় পরিবর্তন ঘটে। এই পর্যায় পরিবর্তনকে বলে ফেইজ ট্রানজিশন বা পর্যায় ক্রান্তি। নিচের টেবিলে আমরা এ সম্পর্কে আরো কিছু তথ্যাদি তুলে ধরেছি।

পর্যায় ক্রান্তি	নাম	দৃষ্টান্ত
কঠিন – তরল	গলন, একীভুত হওয়া	বরফ ও তুষারের গলন
কঠিন – গ্যাস	ঊর্ধ্বপাতন	শুষ্ক বরফের ঊর্ধ্বপাতন
তরল – কঠিন	হিমায়িত হওয়া	পানি কিংবা তরল ধাতু হিমায়িত হওয়া
তরল – গ্যাস	বাষ্পীভবন	পানি বাষ্পীভবন হওয়া
গ্যাস – তরল	ঘনীবভন, তরল প্রক্রিয়া	শিশির হওয়া, কার্বন ডাইওক্সাইড তরল হওয়া
গ্যাস – কঠিন	ঘনীবভন, অবক্ষেপণ	হিম ও বরফ হওয়া

৪.২.৪ কিনেটিক থিওরী অব গ্যাসেস (Kinetic theory of gases)

উপরে বর্ণিত গ্যাস সম্পর্কিত আইন-কানুন মূলত পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তারা বিভিন্ন অবস্থায় গ্যাসের চরিত্র নিরূপণ করেছেন মাত্র। কিন্তু গ্যাসের চরিত্রের সঠিক কারণ বের করতে পারেন নি। আধুনিক

যুগে এসে আমরা গ্যাসের এসব চরিত্রের কারণ একটি থিওরীর মাধ্যমে বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেছি। এই থিওরীর নাম কিনেটিক থিওরী অব গ্যাসেস।

কিনেটিক থিওরী আমাদেরকে বলছে: গ্যাস মূলত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্টিকেলের সমন্বয়ে গঠিত। এসব পার্টিকেল খুব দ্রুত চলন্ত থেকে একে অন্যের মধ্যে ও পাত্রের দেওয়ালে সর্বদা সংঘর্ষে বিদ্যমান। চাপ বা প্রেশার মূলত বড় মাত্রার একটি মাপ যার মাধ্যমে আমরা বুঝতে সক্ষম হই এসব ক্ষুদ্র পার্টিকেল পাত্রের দেওয়ালে কতো শক্তভাবে সংঘর্ষে লিপ্ত আছে। আর তাপমাত্রা হলো কতো দ্রুত এসব পার্টিকেল চলন্ত আছে তার একটি বিকাশ মাত্র। সুতরাং কিনেটিক থিওরী অনুযায়ী, গ্যাস পাত্রের মধ্যে চাপ সৃষ্টি করার কারণ হচ্ছে কিনেটিক এনার্জি। প্রতিটি পার্টিকেলে এই কিনেটিক এনার্জি (বা গতির কারণে সৃষ্ট এনার্জি) বিদ্যমান। তাপের সঙ্গে কিনেটিক এনার্জি সম্পর্কিত। সুতরাং তাপমাত্রা বাড়ালে গ্যাসের পার্টিকেলে কিনেটিক এনার্জি বৃদ্ধি পাবে। গ্যাসের পার্টিকেলে যে কিনেটিক এনার্জি থাকে তা তার গতির সঙ্গে আনুপাতিক: যতো দ্রুত সে চলবে তার মধ্যে ততো বেশী কিনেটিক এনার্জি থাকবে। গাণিতিকভাবে আমরা বলতে পারি:

$$Ke = 1/2mv^2 \ldots \ldots ৫$$

এখানে Ke হলো কিনেটিক এনার্জি, m হলো পার্টিকেলের ম্যাস এবং v তার গতি।

তরল নাইট্রোজেন

ছবিতে দেখাচ্ছে দু'টি ইলেকট্রনিক যন্ত্রাংশে তরল নাইট্রোজেন ঢেলে ঠাণ্ডা করা হচ্ছে। তরল নাইট্রোজেনের তাপমাত্রা হলো -১৯৬ ডিগ্রী সেলসিয়াস / - ৩২৩ ডিগ্রী ফারেনহাইট। তরল নাইট্রোজেন বাতাসকে ঠাণ্ডাকরণের মাধ্যমে তৈরী হয়। এটা অনেক

উপযোগী। রেফ্রিজারেটরের গ্যাস হলো এই তরল নাইট্রোজেন। এই গ্যাস দ্বারাই হিমায়িত খাদ্য-দ্রব্য তৈরী করা হয়। এছাড়া তরল নাইট্রোজেনের মাধ্যমেই তথাকথিত 'স্পার্ম ব্যাংক' সৃষ্টি করা হয়েছে। পুরুষের বীর্যকে এসব ব্যাংকে দীর্ঘদিনের জন্য জমা রাখা যায়, এতে বীর্য নষ্ট হয় না।

উপরের ছবিতে পাতার উপর সৃষ্ট পানির ফোটায় কিভাবে সারফেস টেনশন কাজ করছে তা দেখাচ্ছে। এই ক্রিয়ার ফলে ফোটাগুলো প্রায় গোলকের মতো হয়ে আছে। মহাকর্ষের ফলে ওগুলো ঠিক গোলাকার হয় নি। পানির মধ্যস্থ মলিউলগুলো পানিকে টেনে রাখলেও উপরিভাগের বাইরে মলিকিউল না থাকায় অনুরূপ ক্রিয়া বিদ্যমান নেই। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে মলিকিউলার শক্তির মধ্যে তারতম্য- যার ফলাফল সারফেস টেনশন।

পঞ্চম অধ্যায়

বিদ্যুৎ ও চুম্বক গবেষণায় ব্যবহারিক গণিত

আজকাল আমরা সবাই বিদ্যুৎ দ্বারা উপকৃত হচ্ছি। বাড়ি, গাড়ি, রাস্তা, কম্পিউটার, টিভি, ভিসিআর, সিডি প্লেয়ার, টেলিফোন, মটর, জেনারেটর, মোবাইল ইত্যাদি সবকিছুই বিদ্যুতের উপর নির্ভরশীল। মূলত আধুনিক সভ্যতা অনেকটা বিদ্যুৎনির্ভর- এরূপ বলা অঠিক হবে না। আমরা গবেষণা দ্বারা বিদ্যুৎ সম্পর্কে অনেক তথ্যাদি জানতে পেরেছি ও তা কাজে লাগাচ্ছি। কিন্তু বিদুৎকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে যেয়ে অবশ্যই ব্যবহারিক গণিতের প্রয়োজন পড়ে। আমরা ইতোমধ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ে মাপজোখের যন্ত্রপাতি সম্পর্কে আলোচনায় ইলেকট্রিক ভল্টমিটার, সার্কেট ও আমিটার সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্যাদি জেনেছি। তবে যথেষ্ট নয়। সুতরাং এ অধ্যায়ের প্রথমাংশে আমরা বিদ্যুতের কিছু মৌলিক পরিচিতিমূলক আলোচনা শেষে কিভাবে ব্যবহারিক গণিতের মাধ্যমে বিদ্যুৎ নিয়ে গবেষণা করা হয় তা আরো বিস্তারিতভাবে তুলে ধরবো।

বিদ্যুতের সঙ্গে চুম্বক অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বাস্তবে একটা ছাড়া আরেকটা কল্পনাও করা যায় না। বিদুৎ উৎপাদনেও চুম্বকের ব্যবহার অপরিহার্য। সুতরাং অধ্যায়ের দ্বিতীয়াংশে প্রথমে চুম্বক নিয়ে কিছু পরিচিতিমূলক তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করার পর আমরা চুম্বক বিজ্ঞানে ব্যবহারিক গণিতের বিভিন্ন দিকের উপর কিছু আলোচনা করবো।

৫.১ বিদ্যুৎ

বিদ্যুৎ মূলত একটি মৌলিক এনার্জি। বস্তুর মধ্যস্থ ক্ষুদ্রতম অংশ ইলেকট্রন ও প্রটনে **'চার্জ' (charge)** এর মাধ্যমে এর উৎপত্তি ঘটে। চার্জ ঐ অবস্থাকে বলে যখন ইলেকট্রন বা প্রটনের ব্যালান্সের মধ্যে তারতম্য ঘটে। ইলেকট্রিক চার্জ স্থির কিংবা চলন্ত হতে পারে। স্থির অবস্থায় যে চার্জের সৃষ্টি হয় তাকে বলে স্টেটিক ইলেকট্রিসিটি **(static electricity)** ও চলন্ত চার্জকে বলে কারেন্ট **(current)**।

বাস্তবে সমগ্র মহাবিশ্বব্যাপী ইলেকট্রিক্যাল ক্রিয়া সর্বদাই ঘটছে। মলিকিউল নামক একাধিক এটমে তৈরী বস্তুর ক্ষুদ্র অংশগুলো এই ইলেকট্রিক্যাল শক্তির ফলে একে অন্যের মধ্যে আকর্ষণ সৃষ্টি করে অস্তিত্ব বজায় রাখে। মানবদেহ ও যাবতীয় জীব-

জন্তুতে নিউরন (**Neuron**) নামক নার্ভ কোষের মধ্যে দুর্বল ইলেকট্রিক সিগনাল আদান-প্রদানের মাধ্যমে নার্ভাস সিস্টেম ক্রিয়া করে। ইলেকট্রিসিটি সর্বদাই স্বাভাবিকভাবে উৎপাদন হয় এবং তা তাপ, আলো, গতি এবং অন্যান্য ধরনের এনার্জিতে রূপান্তর হয়। কৃত্রিম উপায়েও আমরা ইলেকট্রিসিটি তৈরী করে কাজে লাগাচ্ছি।

বিদ্যুৎ বিভিন্ন উপায়ে সৃষ্ট হতে পারে। এটাকে দূর-দূরান্তে আলোকের গতিতে প্রেরণ করা যায় এবং প্রয়োজনে অন্য ধরনের এনার্জিতে রূপান্তরও করা সম্ভব। এছাড়া বিশেষ উপায়ে উৎপাদিত বিদ্যুৎ জমা রেখে পরবর্তীতে কাজে লাগানো যায়। বিদুৎ এনার্জির এসব বৈশিষ্ট্যের ফলে আধুনিক যুগে এর ব্যবহার সর্বাপেক্ষা বেশী হচ্ছে।

৫.২ বৈদ্যুতিক চার্জ ও কুলম্ব'স আইন (Electric charge & Coulomb's law)

আমার ইতোমধ্যে বলেছি বিদ্যুৎ মূলত চার্জের সঙ্গে সম্পৃক্ত। বিপরীত চার্জযুক্ত বস্তুতে থাকে আকর্ষণ আর একই ধরনের চার্জযুক্ত বস্তুর মধ্যে ক্রিয়া করে বিকর্ষণ। কুলম্ব'স আইন দ্বারা স্থির বিদ্যুতে চার্জ অবস্থাকে বুঝানো যায়: **"দু'টি চার্জ বস্তুর মধ্যকার ফোর্স তাদের চার্জের গুণফলের সঙ্গে সরাসরি আনুপাতিক ও তাদের মধ্যকার দূরত্বের স্কোয়ারের সাথে উল্টোভাবে আনুপাতিক"**। ১ ইউনিট ইলেকট্রিক চার্জ সমান ৬.২৪ × ১০^{১৮} ইলেকট্রন বা প্রটন। এই চার্জকে বলে ১ কুলম্ব। একটি সমীকরণের মাধ্যমে এই আইনকে এভাবে লিখা যায়:

$$\mathbf{F = K_0 q_1 q_2 / r^2} \text{ ----১}$$

এখানে F হলো চার্জ বস্তুদ্বয়ের মধ্যকার ফোর্স, K_0 -একটি অপরিবর্তনশীল রাশি যা মূলত ১/৪×π×৮.৮৫× ১০$^{-১২}$ = ৬.৬৭২৫ × ১০$^{-১২}$। q_1 হলো প্রথম চার্জ ও q_2 হলো দ্বিতীয় চার্জ এবং r তাদের মধ্যকার দূরত্ব। উল্লেখ্য মিটার-কিলোগ্রাম-সেকেন্ড তথা এসআই সিস্টেমে ব্যবহৃত ইউনিটের ক্ষেত্রে এই সমীকরণ প্রযোজ্য হবে। সুতরাং স্টেটিক বিদ্যুতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাশি বের করতে যেয়ে আমরা এই সমীকরণ ব্যবহার করতে পারি।

৫.৩ বৈদ্যুতিক কারেন্ট (Electric current)

আমরা ইতোমধ্যে স্থির বিদ্যুতের উপর কিছুটা আলোচনা করেছি। বাস্তবে স্থির থেকে চলন্ত বিদ্যুতের ব্যবহার হয় বেশী- তাই, চলন্ত বিদ্যুৎ বা করেন্টের উপর আমাদেরকে বিস্তারিত জেনে নিতে হবে। এছাড়া বিদুৎ সম্পর্কিত বিভিন্ন ইউনিটের হিসাব পেতে ব্যবহারিক গণিতের উপর আলোচনা করতে হবে।

চার্জ চলন্ত হওয়াকেই বলে ইলেকট্রিক কারেন্ট। নেগিটিভ বা ঋণাত্মক চার্জ পজিটিভ বা ধনাত্মক চার্জের দিকে চলন্ত হয়। দু'টি ভিন্ন (একটি পজিটিভ ও অপরটি নেগিটিভ) চার্জ বস্তুর মধ্যে যদি চার্জ সহজে চলতে দেয় এমন কোনো ধাতুর তৈরী তার যেমন তামা (একটি কন্ডাকটার) সংযুক্ত করা হয় তাহলে চার্জ চলতে থাকবে। এই চলন্ত চার্জই হলো কারেন্ট। তবে কারেন্ট চলন্ট হতে একটি ফোর্সের প্রায়োজন যাকে বলে পটেনশিয়্যাল ডিফারেন্স (**Potential difference**)। কারেন্টের ইউনিট হলো আমপিয়ার (**Ampere**), পটেনশিয়্যাল ডিফারেন্সের ইউনিটের নাম ভলটেজ (**Voltage**)। এছাড়া কারেন্টকে চলতে দিতে একটি বিপরীতমুখী শক্তি কাজ করে যাকে বলে রেজিসটেন্স (**Resistance**), এটার ইউনিট হলো ওহম্‌স (**Ohms**)। আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই তিনটির মধ্যে সম্পর্ক দেখেছি। গাণিতিকভাবে আমরা এই সম্পর্ককে তুলে ধরেছি নিম্নের সমীকরণ দ্বারা:

$$V = IR$$

এখানে V হলো ভলটেজ, I হলো ইলেকট্রিক কারেন্ট ও R হলো রেজিসটেন্স। এই সমীকরণকে বলে ওহমস্ আইন।

৫.৪ বিদ্যুৎ ও তাপ (Electricity & heat)

যখন কারেন্ট কোনো কন্ডাকটারের মধ্য দিয়ে চলতে থাকে তখন তা গরম হয়ে ওঠে। এটা হওয়ার কারণ হলো কন্ডাকটারের মধ্যস্থ রেজিসটেন্স শক্তি। সুতরাং যতো বেশী কারেন্ট চলবে উষ্ণতাও ততো বেশী হবে। এছাড়া কন্ডাকটারেও যতো বেশী রেজিসটেন্স ক্ষমতা হবে তাপও ততো বেশী হবে। এই তাপ সৃষ্টিকে গাণিতিকভাবে বলা যায়:

$$H = I^2Rt \text{ (joules)}$$

এখানে H হলো তাপমাত্রা (জুলস ইউনিটে), I হলো কারেন্ট (আমপ), R হলো রেজিসটেন্স (ওহম) এবং t হলো সময় (সেকেন্ড)। কারেন্টকে চলন্ত রাখতে এনার্জির প্রয়োজন। এই এনার্জিকে বলে পাওয়ার। জেনারেটরের পাওয়ার কী তা নিম্নলিখিত সমীকরণ দ্বারা পাওয়া যায়।

$$P = I^2R$$

এখানে P হলো পাওয়ার (ওয়াট), I হলো কারেন্ট (আমপ) এবং R হলো রেজিসটেন্স (ওহম)।

৫.৪ সিরিজ ও প্যারালেল সার্কেট (Series & parallel circuit)

দ্বিতীয় অধ্যায়ে এই উভয় ধরনের ইলেকট্রিক সার্কেটের কথা উল্লেখ করেছি। এছাড়া একটি চিত্রের মাধ্যমে এর স্বরূপ দেখানে হয়েছে। এখন আমরা জানবো এসব সার্কেটে যেসব ইলেকট্রিক যন্ত্রাদি যেমন রেজিস্টার, কেপাসিটার, বাল্ব ইত্যাদির মধ্যস্থ কারেন্ট,
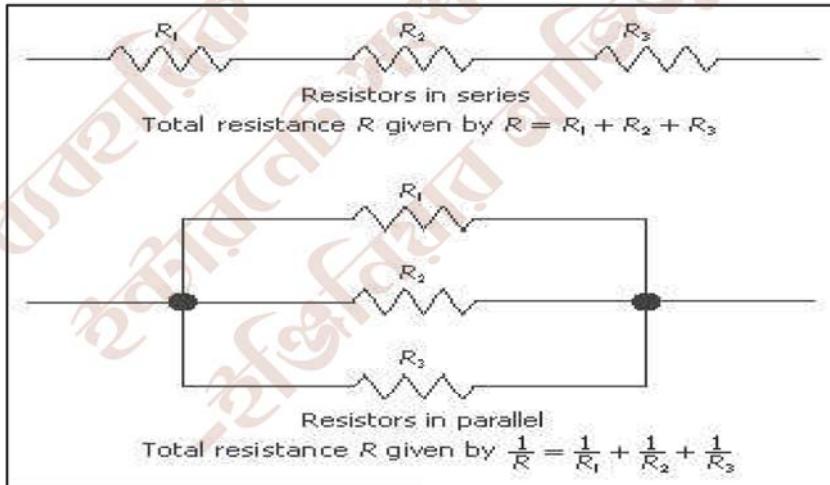
রেজিসটেন্স ও ভলটেজ কিভাবে বের করতে হবে। উপরে আমরা সিরিজ ও প্যারালেল সার্কেটদ্বয়ের আরেকটি চিত্র তুলে ধরেছি।

প্রথম সার্কেটটি সিরিজ সার্কেট ও এতে আছে তিনটি রেজিস্টার। সুতরাং মোট রেজিসটেন্স হবে সবগুলোর যোগফল। অপরদিকে দ্বিতীয় সার্কেটটি প্যারালেল সার্কেট হওয়ায় মোট রেজিসটেন্স হবে ভিন্ন। আমরা এই সমীকরণকে এভাবেও লিখে পারি:

$$1/R \times (R_1R_2R_3) = R_1R_2R_3 \times (1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3)$$
$$(R_1R_2R_3)/R = (R_2R_3 + R_1R_3 + R_1R_2)$$
$$R = (R_1R_2R_3) / (R_2R_3 + R_1R_3 + R_1R_2)$$

৫.৫ বৈদ্যুতিক ফিল্ড (Electric fields)

একটি ইলেকট্রিক চার্জে থাকে আকর্ষণ কিংবা বিকর্ষণ ক্ষমতা। তার এই গুণটি প্রকাশ পায় যে মুহূর্তে অন্য কোনো চার্জ নিকটবর্তী হবে। এই আকর্ষণ-বিকর্ষণ ক্ষমতাকে আমরা চার্জের চতুর্দিকে একটি ফিল্ড হিসাবে মনে করতে পারি। বাস্তবে তা-ই এবং এটাকে ইলেকট্রিক ফিল্ডের শক্তি বলা যায়। সকল চার্জ বস্তুর চতুর্দিকে এই ইলেকট্রিক ফিল্ড বিদ্যমান। নিচের ছবিতে চার্জের চতুর্দিকে ইলেকট্রিক ফিল্ডকে লাইন দ্বারা দেখানো হয়েছে। বায়ের ছবিতে দু'টি পজিটিভ চার্জ নিকটবর্তী হয়ে যে ফিল্ডের সৃষ্টি করে তা অঙ্কিত হয়েছে আর ডানের ছবিতে বিপরীত দু'টি চার্জের ফিল্ড দেখানো হয়েছে।
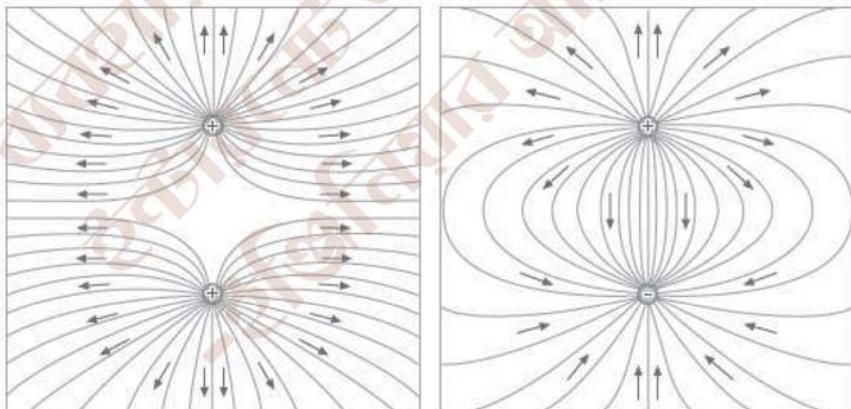
৫.৫ বিদ্যুৎ ও চুম্বকত্ব (Electricity & magnetism)

আগেই বলেছি বিদ্যুৎ ও চুম্বকের মধ্যে সম্পর্ক বিদ্যমান। দু'টি বিপরীত ইলেকট্রিক চার্জ যেভাবে একে অন্যকে আকর্ষণ করে ঠিক তদ্রূপ দু'টি বিপরীত চুম্বক (উত্তর ও দক্ষিণ মেরু) একে অন্যকে আকর্ষণ করে। উভয় ক্ষেত্রে এর বিপরীত ক্রিয়াও একই ধরনের। অর্থাৎ দু'টি নেগিটিভ কিংবা পজিটিভ চার্জ একে অন্যকে বিকর্ষণ করে যেভাবে দু'টি উত্তর-উত্তর বা দক্ষিণ-দক্ষিণ মেরুবিশিষ্ট চুম্বক বিকর্ষণ করে। সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে চুম্বক ও চার্জের মধ্যে একই ধরনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বিদ্যমান। এখন জানার ব্যাপার হলো চুম্বর ও চার্জ তথা ইলেকট্রিসিটির মধ্যে সম্পর্কটা আসলে কী?

সম্পর্কতো অবশ্যই আছে আর এটাকে বিজ্ঞানের ভাষায় "**ইলেকট্রমেগনেটিজম**" (electromagnetism) বলে।

৫.৫ বিদ্যুতে চুম্বকীয় ক্রিয়া (Magnetic effect of electricity)

আমরা জানি যে কোনো ইলেকট্রিজ চার্জের চতুর্দিকে একটি ইলেকট্রিক ফিল্ড থাকে। ইলেকট্রিক চার্জ চলন্ত হলে একটি কারেন্টের সৃষ্টি হয়। আর কারেন্টের চতুর্দিকে একটি মেগন্যাটিক ফিল্ডের ফিল্ডের জন্ম নেয়। চলন্ত কারেন্টের নিকটে চুম্বক নিয়ে আসলে এই ক্রিয়া দেখতে পাওয়া যায়।

বাস্তবে কম্পাসের সূচ কারেন্টের নিকটে এনে এই সম্পর্ক আবিস্কৃত হয়েছিল। এখন প্রশ্ন জাগে চুম্বক ফিল্ডের গতিপথ ও কারেন্টের গতিপথ কিভাবে নির্ণিত হবে। এটা নির্ণয়ের জন্য "রাইট-হ্যান্ড রুল" নামক একটি আইন ব্যবহার করা যায়। নিচের চিত্রে এই আইনটি তুলে ধরা হয়েছে।
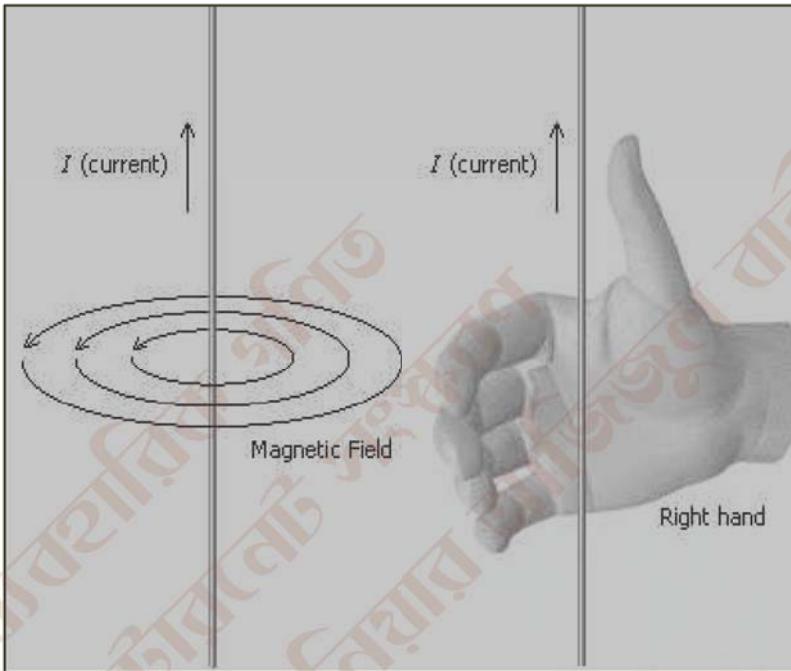
উপেরর চিত্র থেকে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে যে ডান হাত দিয়ে কন্ডকটারকে ধরলে যে দিকে অঙ্গুলগুলোর মাথা যাবে সেদিকে হবে চুম্বক ফিল্ডের গতিপথ এবং উপরের দিকে অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলির মাথার দিকে হবে কারেন্টের গতিপথ।

কারেন্ট ও চুম্বকত্বের মধ্যে যে দু'টি সম্পর্ক আমাদের জানা থাকা জরুরী তাহলো: ১. যদি কোনো ইলেকট্রিক ফিল্ডের মধ্যে কন্ডাকটার নড়াচড়া করে তাহলে কন্ডাকটারে কারেন্টের জন্ম নেয় এবং ২. যদি কোনো চলন্ত ইলেকট্রিক ফিল্ড স্থির কোনো কন্ডকটারের নিকটে থাকে তাহলেও কন্ডাকটারের মধ্যে কারেন্টের সৃষ্টি হয়। এই দু'টি

ক্রিয়াকেই কাজে লাগিয়ে জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে। আমরা জানি তারের মধ্যে চলন্ত কারেন্ট থাকলে চতুর্দিকে একটি চুম্বক ফিল্ডের জন্ম হয়। অপরদিকে চুম্বকের মধ্যেও ফিল্ড বিদ্যমান। সুতরাং কোনো তার যদি চুম্বক ফিল্ডের নিকট থাকে তাহলে চুম্বকের ফিল্ড একে ঠেলে দূরে সরিয়ে দেয়। এই ক্রিয়াকে কাজে লাগিয়েই বৈদ্যুতিক মোটর তৈরী করা হয়।

৫.৬ ইম্পিডেন্স (Impedence)

দু' ধরনের কারেন্ট আছে। এর প্রথমটিকে বলে "ডাইরেক্ট কারেন্ট" (direct current) অপরটির নাম "অলটারনেটিং কারেন্ট" (alternating current)। ইঞ্জিনিয়ারদের মতে দ্বিতীয় প্রকারের কারেন্ট উত্তম। তবে উভয় ক্ষেত্রেই চলন্ত কারেন্টের বিরুদ্ধে কিছু শক্তি কাজ করে। এসব বিপরীত শক্তিগুলোর মধ্যে রেজিসটেন্স, সার্কেট ডিজাইন, কারেন্টের গতি ও শক্তি, ভলটেজের মাত্রা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সবগুলো মিলে যে নেতিবাচক ক্রিয়ার সৃষ্টি হয় তাকে একত্রে "**ইম্পিডেন্স**" **(সংরোধ)** শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়।

এই ইম্পিডেন্স, ইফেক্টিভ কারেন্ট ও ইফেক্টিভ ভলটেজের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক বিদ্যমান। গণিতিকভাবে এই সম্পর্ককে একটি সমীকরণ দ্বারা উপস্থাপন করা যায়:

$$V = IZ$$

এখানে V হলো ইফেক্টিভ ভলটেজ (ভল্ট), I হলে ইফেক্টিভ কারেন্ট (আম্প) এবং Z হলো ইমপিডেন্স (ওহম)।

চুম্বকের ব্যবহার আজকাল সর্বত্র বিদ্যমান। যেখানেই বিদ্যুতের ব্যবহার আছে সেখানেই চুম্বক কাজে লাগানো হয়। ছবিতে চুম্বক চালিত "**মেগনেটিক লেভিটেশন ট্রেন**" দেখা যাচ্ছে। চুম্বকের উপর ভিত্তি করে চলন্ত এই ট্রেন ঘণ্টায় ২৭০ মাইল গতিতে চলতে সক্ষম।

ষষ্ঠ অধ্যায়

আলোকবিজ্ঞান ও ব্যবহারিক গণিত

ব্যবহারিক গণিতের বিচরণ বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায়। রসায়ন, আনবিক, পদার্থ ইত্যাদি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিরাট বিরাট শাখা মূলত ব্যবহারিক গণিতের উপর নির্ভরশীল। আমরা অবশ্য সবগুলোর উপর আলোচনায় যাচ্ছি না। এরূপ ব্যাপক গবেষণা মূলত অত্র বইয়ের আওতার বাইরে। তবে Study of light বা আলোকবিজ্ঞানে ব্যবহারিক গণিতের স্বরূপ নিয়ে কিছুটা আলোচনা অবশ্যই প্রয়োজন।

৬.১ আলো কী?

আলোকবিজ্ঞানে গণিতের ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনায় যাওয়ার পূর্বে আলো বলতে কী বুঝায় তা আমাদেরকে প্রথমে জেনে নিতে হবে। আলো মূলত একটি চলন্ত এনার্জির নাম। আমরা অবশ্য এনার্জির উপর একটি আলাদা অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো। তবে এই মুহূর্তে এটুকু জানাই যথেষ্ট যে, এনার্জি অর্থ বস্তুর মাধ্যমে কার্য করার ক্ষমতা। বস্তুর মধ্যে সৃষ্ট চার্জ কণা চলন্ত হয়ে আলো হিসাবে বিকিরণ হয় যা আমাদের চোখে দেখা যায়। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে জানতে পেরেছেন যে, আলো কোনো সময় কণার মতো আবার কোনো সময় তরঙ্গ হিসাবে চলে। কণার মতো চলন্ত আলোকে বলা হয় "ফটোন" (**Photon**)। এসব ফটোন অন্যান্য অণু-কণার মতো নয় কিন্তু। এগুলো মূলত ওজনশূন্য এনার্জি যা শূন্যস্থানের উপর ৩০০,০০০ কিলোমিটার প্রতি সেকেন্ডে গতিশীল থাকে। আলোকের সাথে সম্পর্কিত তরঙ্গকে বলে "ইলেকট্রম্যাগনেটিক তরঙ্গ" (Electromagnetic waves)। এতে এটাই বুঝায় যে, তাদের মধ্যে পরিবর্তনশীল বিদ্যুৎ ও চুম্বকীয় ফিল্ড বিদ্যমান। তবে ঠিক কিভাবে আলোকরশ্মি সূত্রের মধ্যে সৃষ্টি হয়ে বেরিয়ে আসে? এই প্রশ্নের জবাব পেতে হলে আমাদেরকে আগে বুঝতে হবে বস্তুর ক্ষুদ্র অংশ এটম বা অণুকে।

৬.২ আলোকরশ্মি ছাড়া ও চুষা (Light emission and absorption)

একটি এটমের মধ্যে আছে ইলেকট্রন, প্রটন ও নিউটট্রন। প্রটন ও নিউট্রন থাকে ইলেকট্রনের কেন্দ্রে। ইলেকট্রন এই কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করে। এই প্রদক্ষিণরত ইলেকট্রনই আলোকরশ্মি ছেড়ে দিতে বা বিকিরণ করতে পারে। ইলেকট্রনগুলো আসলে কিছু বিশেষ পথে চলে যাকে বলে অরবিটাল (Orbital)। এসব অরবিটালে বিশেষ মাত্রায় এনর্জি বিদ্যমান। প্রত্যেক অরবিটালে যে পরিমাণ এনার্জির প্রয়োজন তাকে বিজ্ঞানের ভাষায় "এনার্জি লেবেল অব দ্যা এটম" বলে। কেন্দ্রের নিকটে ঘুর্ণমান ইলেকট্রনের এনার্জি দূরে ঘুর্ণমান ইলেকট্রনের এনার্জি থেকে মাত্রায় অনেকটা কম। নিম্নতম এনার্জি লেবেলে ইলেকট্রন থাকলে কোনো বিকিরণ হবে না, যদিও তা চলন্ত থাকে। কিন্তু নিম্ন লেবেলে ইলেকট্রন যদি কিছু এনার্জি পায় তাহলে তাকে লাফ মেরে উপরের লেবেলে উঠতে হয়। এই অবস্থাকে "এক্সাইটেড এটম" অবস্থা বলে। ইলেকট্রনের এই লাফের সময় কিছু এনার্জি ক্ষয় হয় এবং সে আবার নিচের স্তরে নেমে আসে। যে পরিমাণ এনার্জি ক্ষয় হবে তা বেরিয়ে আসবে। এই এনার্জির মাত্রা হলো উপরের ও নিচের এনার্জি স্তরের পার্থক্যের সমপরিমাণ। এই বেরিয়ে আসা এনার্জি ফটোন হিসাবে বিকিরণ হতে পারে- অর্থাৎ আলো। নিচের চিত্রে ব্যাপারটি দেখানো হয়েছে।
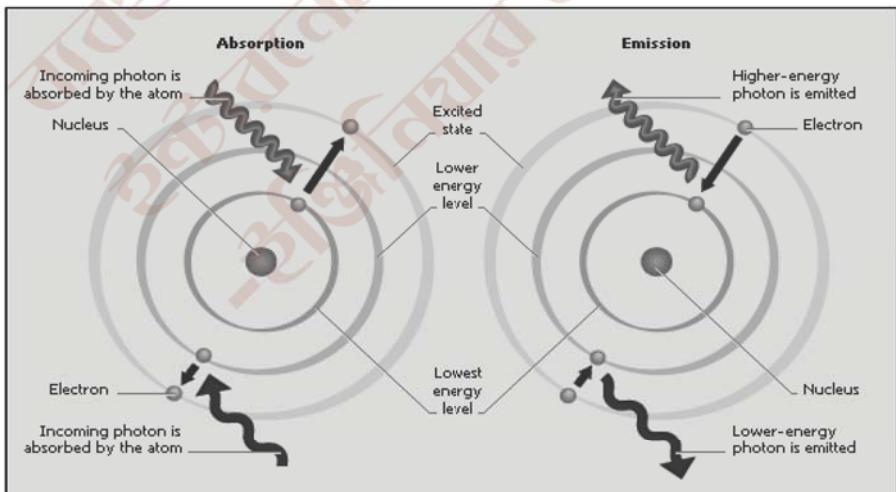
প্রত্যেক এটমের একগুচ্ছ আলাদা একক এনার্জি লেবেল আছে। আর এসব এনার্জি থেকে বিষেশ কিছু ফটোন এটমটি বিকিরণ করতে সক্ষম। এই উভয় তথ্যকে একত্রে এটমের স্পেকট্রাম বা ফিঙ্গারপ্রিন্ট বলা চলে। এই ফিঙ্গারপ্রিন্টের মাধ্যমে এটমের পরিচিতি মিলে। সুতরাং কোনো বস্তুকে তার স্পেকট্রাম গবেষণার মাধ্যমে সনাক্ত করা যাবে- আর এই সনাক্তকরণ প্রক্রিয়াকে বলে স্পেকট্রোসকপি (Spectroscopy)। যেসব আইনের মাধ্যমে এটমের এনার্জি লেবেলকে বুঝানো হয় তার নাম "ক্যুয়ান্টাম থিওরী" (Quantum theory)। আমরা এনার্জি সম্পর্কে আলোচনার সময় এই থিওরীরর উপর বিস্তারিত তথ্যাদি তুলে ধরবো।

৬.৩ ইলেকট্রমেগন্যাটিক তরঙ্গ (Electromagnetic wave)

অস্তিতিশীল বা এক্সাইটেড এটম থেকে ফোটন নির্গত হয়ে আলোকের সৃষ্টি করে। এই আলোকরশ্মির মধ্যে দু'টি আলাদা তরঙ্গ একত্রে ক্রিয়া করে ফোটনকে নিয়ে যায়। এই তরঙ্গের একটি হলো ইলেকট্রিক ও অপরটি মেগনেটিক। উভয়টিকে একত্রে ইলেকট্রোমেগন্যাটিক ওয়েভ বলে। নিচের চিত্রে এই ওয়েভটির স্বরূপ পরিষ্কারভাবে তুলে ধরা হয়েছে।
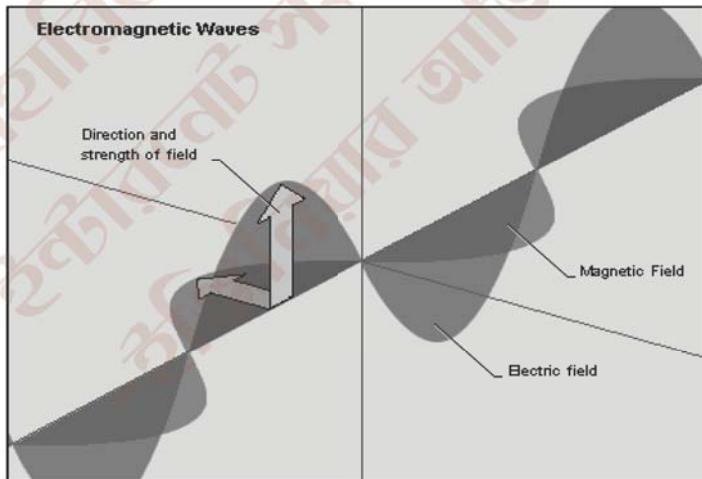
লক্ষ করার ব্যাপার যে, ইলেকট্রিক ফিল্ড ও মেগন্যাটিক ফিল্ড একে অন্য থেকে ৯০ ডিগ্রী কোণে (পারপেন্ডিকুলার) থেকে চলন্ত থাকে। এই ওয়েভটি প্রতি সেকেন্ডে ৩ লক্ষ

কিলোমিটার বেগে চলে। এছাড়া এই তরঙ্গ কোনো মাধ্যম ছাড়াই চলতে পারে। সুতরাং আলেকরশ্মি দূরবর্তী তারা থেকে মহাশূন্য পাড়ি দিয়ে আমাদের পৃথিবীতে পৌঁছুতে কোনো অসুবিধা হয় না। এই একই কথা কিন্তু শব্দ তরঙ্গের বেলা সত্য নয়- কারণ শব্দ তরঙ্গ মিডিয়াম বা মাধ্যম ছাড়া চলতে পারে না। মহাশূন্যে তাই অতি নিকটবর্তী কারো কথা শ্রবণ করা যায় না। রেডিও তরঙ্গ দ্বারা এ কাজ আঞ্জাম দেওয়া হয়। আর রেডিও তরঙ্গ মূলত ইলেকট্রোমেগন্যাটিক তরঙ্গের একটি অংশ মাত্র। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (ওয়েভলেন্থ) ও ফ্রিকুয়েন্সি (সকেন্ডে ক'টি তরঙ্গ হচ্ছে তার একটি হিসাব) এই দু'টি মাত্রার উপর নির্ভর করে ওয়েভটি কোন্ পর্যায়ের। নিচের স্পেকট্রাম চিত্র থেকে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে আশারাখি।
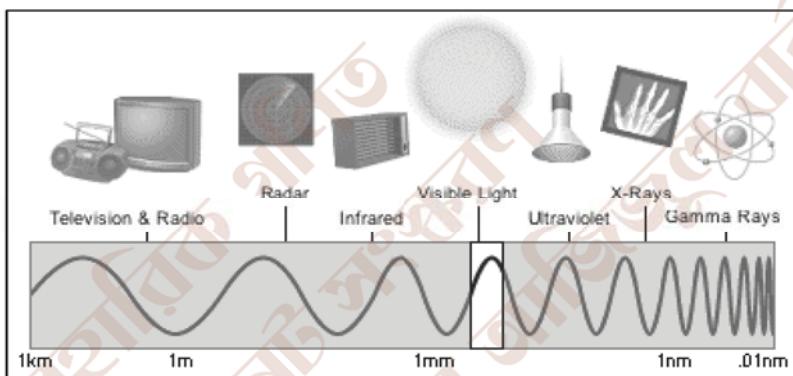
উপরের ছবিতে ইলেকট্রোমেগন্যাটিক তরঙ্গের বিভিন্ন অবস্থার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। লক্ষ করুণ "দৃশ্যমান আলো" **(Visible Light)** এর ব্যাপ্তি কতো অল্প! এতে এটাই বুঝাচ্ছে যে এই মহাবিশ্বের অনেক বস্তুই আমাদের দৃষ্টিসীমার বাইরে অবস্থান করছে। বেশিরভাব বস্তুই আমরা দেখি না!

৬.৪ তরঙ্গদৈর্ঘ্য, ফ্রিকুয়েন্সি এবং তরঙ্গ-উচ্চতা

তরঙ্গদৈর্ঘ্য হলো দু'টি তরঙ্গের শীর্ষ পয়েন্টের মধ্যে দূরত্ব। ফ্রিকুয়েন্সি অর্থ প্রতি সেকেন্ড ক'টি তরঙ্গ সৃষ্টি হচ্ছে তার হিসাব এবং তরঙ্গ-উচ্চতা বা অ্যামপ্লিটিউড অর্থ তরঙ্গের উচ্চতার একটি মাপ। দৃশ্যমান আলোকের তরঙ্গদৈর্ঘ্য মিটার বা নানোমিটার (এক

মিটারের এক বিলিয়ন ভাগের এক ভাগ) ইউনিটে মাপা হয়। ফ্রিকুয়েন্সির ইউনিটকে বলে হার্টজ (Hertz)। তরঙ্গের গতি, ফ্রিকুয়েন্সি ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য নিচের সমীকরণ থেকে বের করা যায়:

$$c = lf$$

এখানে c হলো আলোকের গতি (যা মূলত ৩ × ১০^{৮} মিটার প্রতি সেকেন্ড)। l হলো মিটার হিসাবে তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং f হলো তরঙ্গের ফ্রিকুয়েন্সি (হার্টজ)।

৬.৪ ফটোন এনার্জি

আগেই বলেছি আলোকরশ্মি ফটোন নামক 'প্যাকেট' হিসাবে বিকিরণ হয়। তবে ফটোন সর্বদাই ইলেকট্রোমেগন্যাটিক তরঙ্গের সঙ্গে সম্পৃক্ত। জার্মান পদার্থবিদ ম্যাক্স প্লাংক ফটোন আবিষ্কার করেন। তিনি ফটোনের মধ্যে যে এনার্জি আছে তার মাত্রা নির্ণয়ের জন্য একটি সমীকরণ বের করেন- এই সমীকরণ হলো:

$$\mathbf{E_p = fh}$$
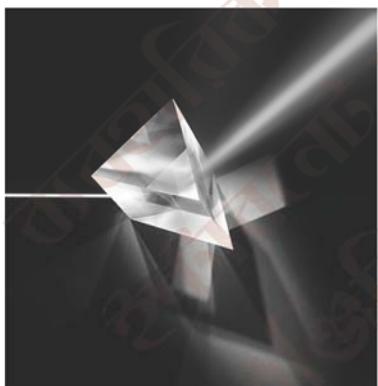
উপেরর সমীকরণে E_p হলো ফটোনের এনার্জি, f ফ্রিকুয়েন্সি এবং h হলো একটি কন্সটেন্ট (অপরিবর্তনশীল রাশি)- যাকে প্লাংক কন্সটেন্ট বলে। এই কন্সটেন্টটি অত্যন্ত ছোট্ট একটি সংখ্যা- কারণ, একক ফটোনের মধ্যে অত্যল্প মাত্র এনার্জি বিদ্যমান। প্লাংক কন্সটেন্ট হলো: ৬.৬২৬ x ১০-^{৩৪} (একটি ডেসিমেল পয়েন্ট পরে ৩৩টি শূন্য বসানোর বাদে ৬৬২৬ সংখ্যাটি এসেছে)।

প্রিজমের ভেতর চলন্ত আলোকরশ্মি: একখানি তিনফলা-কাচ বা প্রিজমের ভেতর দিয়ে যখন আলোকরশ্মি চলন্ত থাকে তখন 'সাদা' আলো ৭টি রংয়ে বিভক্ত হয়ে বের হয়ে আসে। এই সাত রং বিশিষ্ট আলোই হলো আলোকের স্পেকট্রাম। সাধারণত এই স্পেকট্রাম আমরা রঙধনুতে দেখতে পাই।

সপ্তম অধ্যায়
ধ্বনিবিজ্ঞান

ধ্বনি একটি বস্তুভিত্তিক ঘটনা যার ফলাফল হলো শ্রবণেন্দ্রিয়ে ক্রিয়া তথা শোনার অনুভূতি প্রদান। এটা বাতাস বা অন্য কোনো মাধ্যমে তরঙ্গ আকারে ভ্রমণ করে। সুতরাং শব্দ বা ধ্বনি বস্তুভিত্তিক মাধ্যম ছাড়া চলন্ত হয় না। ধ্বনি তরঙ্গের ফ্রিকুয়েন্সি বা সেকেন্ডে ক'টি তরঙ্গ চলে তার একটি হিসাব আছে। পরীক্ষা করে জানা গেছে আমাদের শোণার ব্যাপ্তি ১৫ হাজহার থেকে ২০ হাজার হার্টজের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তবে এই ব্যাপ্তির বাইরেও ধ্বনি সৃষ্টি হতে পারে। আমরা গেল অধ্যায়ে ইলেকট্রমেগন্যাটিক তরঙ্গের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। আমরা দেখেছি কিভাবে এটমের মধ্যে কম্পন বা এক্সাইটমেন্ট হলে আলোকের সৃষ্টি হয়ে তরঙ্গাকারে বিকিরণ হয়। ধ্বনি তরঙ্গও অনুরূপ- তবে পার্থক্য হলো এই কম্পনের জন্য এটমিক স্কেল জরুরী নয়- বরং বাতাসের মধ্যে কম্পন থেকেই এই তরঙ্গের জন্ম হয় এবং তা একটি নির্দিষ্ট গতিতে ভ্রমণ করে।

৭.১ ধ্বনি তরঙ্গের গতি ও তীব্রতা

ধ্বনি তরঙ্গ সাগর লেবেলে শুষ্ক অনুষ্ণ বাতাসের মধ্য দিয়ে ১১৯০ কিমি/ঘণ্টা বেগে চলে। ধ্বনি আগেই বলেছি শুধুমাত্র আমাদের কানে শোণার ব্যাপ্তির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। সুতরাং যে ধ্বনি ২০ কিলোহার্টজের অধিক, তাকে বিজ্ঞানের ভাষায় "আলট্রাসনিক" (Ultrasonic) বলে।

সাধারণত ধ্বনির তীব্রতা মাপা হয় 'ডেসিবেল' (Decibel - db) ইউনিট দ্বারা। ধ্বনির মাত্রা ১০ ডিবি বৃদ্ধি পাওয়ার অর্থ তীব্রতা ১০ গুণ বাড়া। আমরা যখন কানকথা বলি তখন ধ্বনির মাত্রা থাকে ২০ ডিবি। কিন্তু বিমান উড্ডয়নকালে ১২০ ডিবি পর্যন্ত তীব্রতা বেড়ে যায়। আর এই মাত্রাটিই আমাদের কর্ণের জন্য ক্ষতিকর ও বেদনাদায়ক হতে পারে। সুতরাং **'নয়েজ পলুশন'** বা **ধ্বনিদূষণ বা শব্দদূষণ ১২০ ডিবি** থেকে বা তথোধিক ক্ষমতাসম্পন্ন ধ্বনি থেকে হয়ে থাকে। নিচের টেবিলে ধ্বনি ও তীব্রতার সম্পর্ক তুলে ধরা হলো।

ডেসিবেল	ধ্বনির দৃষ্টান্ত
০	শোণার নিম্নতম ধ্বনি
১০	মৃদু বাতাসে পাতার নড়াচড়া
১০	আস্তে কানকথা বলা
২০	সাধারণ কানকথা
২০-৫০	আস্তে আস্তে কথাবার্তা
৫০-৬৫	জোরে কথাবার্তা
৬৫-৭০	ব্যস্ত রাস্তায় যানজট
৬৫-৯০	ট্রেনের ধ্বনি
৭৫-৮০	ফেক্টরী (পাতলা/মধ্যম কাজকর্ম)
৯০	ভারী ট্রাফিক চলাচল
৯০-১০০	বজ্রপাত
১১০-১৪০	জেট বিমানের উড্ডয়ন
১৩০	বেদনার অনুভূতি
১৪০-১৯০	মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ

৭.২ ডপলার ইফেক্ট এবং রেড শিফ্‌ট (Doppler Effect & Red Shift)

ধ্বনি কিংবা ইলেকট্রমেগন্যাটিক তরঙ্গের সঙ্গে সম্পৃক্ত দু'টি ব্যাপার হলো ডপলার ইফেক্ট ও রেড শিফ্‌ট। আসলে উভয়টিই একটা আরেকটার সঙ্গে সম্পর্কিত।

মনে করুন আপনি একটি ফুটপাথে স্থির অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছেন। একখানা গাড়ি দ্রুত আপনার দিকে এগিয়ে আসছে। আপনি এটির ইঞ্জিনের শব্দ শ্রবণ করছেন। গাড়িটা যতোই কাছে আসবে ইঞ্জিনের শব্দ আপনার কানে ততোই বেশী বলে মনে হবে। কিন্তু যখন এটি দ্রুত আপনার নিকট থেকে দূরে সরে যেতে থাকবে তখন ইঞ্জিনের শব্দ অনেকটা কম মনে হবে। নিচের চিত্রে বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে।

একইভাবে আলোকরিশ্মি যেহেতু তরঙ্গের তৈরী তাই আলোকের সূত্র কিংবা পর্যবেক্ষক যদি গতিশীল হয় তাহলে তরঙ্গের মধ্যে তারতম্যের সৃষ্টি হবে। এই তারতম্য দেখার একটি উপায় হলো আলোকের রং বদল। আলোকের স্পেকটার্ম কিভাবে দেখা যায় তা ইতোমধ্যে আমরা বলেছি। এই স্পেকট্রামের বায়ের দিকে থাকে লাল ও ডানে নীল রং। নিচে সূর্য থেকে আগত আলেকরশ্মির একটি স্পেকট্রাম দেওয়া হলো।

সূর্যের আলোকের স্পেকট্রাম

আমরা যখন দূরবর্তী তারার আলো এভাবে স্পেকট্রাম দ্বারা গবেষণা করবো তখন আলোকরশ্মি হয় বায়ের দিকে (লাল-লিফ্‌ট) না হয় ডানের দিকে (নীল-শিফ্‌ট) করবে। এই তথ্য থেকে আমরা বুঝতে পারবো আলোকের সূত্র তথা তারাটি আমাদের থেকে দূরে যাচ্ছে (লাল-লিফ্‌ট) না কাছে আসছে (নীল-শিফ্‌ট)। পরীক্ষা করে দেখা গেছে প্রায় সবগুলো তারাসিস্টেম (গ্যালাক্সি) খুব দ্রুত দূরে সরে যাচ্ছে। এ তথ্য থেকেই

"বিস্তারী বিশ্ব" (Expanding Universe) থিওরী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যা হোক, এখন আমরা রেড-শিফটের গাণিতিক সমীকরণ নিয়ে আলোচনায় যাচ্ছি।
লাল-শিফটের গাণিতিক সমীকরণ হলো:

$$z = v/c$$

এখানে z হলো রেড শিফটের মাত্রা (সংখ্যা), v হলো সূত্র বা বস্তুর গতি এবং c হলো আলোকের গতি (যা মূলত ৩০০,০০০ কিমি/সে)। মনে করুন কোনো তারার লাল-শিফ্ট = ০.০০১. তাহলে তার গতি কতো হবে? উক্ত সমীকরণ থেকে তা হবে ৩০ কিমি/সে।

উপরের সমীকরণ সাধারণ গতিশীলতার ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হতে পারে মাত্র। গতি যদি খুব উচ্চ হয়, যাকে বিজ্ঞানের ভাষায় রিলেটিভিস্টিক বলে, তাহলে উক্ত সমীকরণে কাজ হবে না। সে ক্ষেত্রে রিলেটিভিটি থিওরীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সীমকরণ দরকার। আমরা এই মুহূর্তে রিলেটিভিটি থিওরী সম্পর্কে আলোচনায় না যেয়ে শুধুমাত্র সমীকরণটি এখানে লিপিবদ্ধ করবো মাত্র। এই সমীকরণ হলো:

$$z = \sqrt{(c+v)/(c-v) + 1}$$

৭.৩ রেড-শিফ্ট ও হাবল আইন (Hubble's Law)

আমরা ইতোমধ্যে দেখেছি কিভাবে দূরবর্তী তারার গতি রেড-শিফ্ট থেকে নির্ণয় করা সম্ভব। বাস্তবে বিশ্বজগতের অধিকাংশ বস্তুই আমাদের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই রেড-শিফ্ট থেকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, সমগ্র মহাবিশ্ব দিন দিন চতুর্দিকে বর্ধিত হচ্ছে। রেড-শিফটের মাত্রা গবেষণা করে বিজ্ঞানীরা একই আইন আবিষ্কার করেছেন যা থেকে দূরত্বের সঙ্গে রেড-শিফটের মাত্রার সম্পর্ক পাওয়া যায়। এই আইনকে বলে "হাবল'স ল'। এতে বলা হয়েছে: কোনো গ্যালাক্সির গতি (v) পৃথিবী থেকে এর দূরত্বের (d) সঙ্গে আনুপাতিক। গণিতিকভাবে বলা যায়:

$$v = H_0 d$$

এখানে H_0 হলো হাবল'স কন্সটেন্ট। ১৯২৯ সালে এই আইন প্রতিষ্ঠিত হলেও আজো হাবল'স কন্সটেন্টের সঠিক মাত্রা নিশ্চিতভাবে পাওয়া যায় নি। তবে এটা যে ৬৪ থেকে

৭৮ কিলোমিটার/সেকেন্ড/মেগাপারসেক-এর মধ্যে বিদ্যমান তা নিশ্চিত। ১ পারসেক = ৩৮.৮৬ ট্রিলিয়ন কিলোমিটার। আর ১ মেগাপারসেক = ১ মিলিয়ন পারসেক।

জ্যেতির্বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের আয়তন, বয়স, গতি ইত্যাদি রেড-শিফ্‌ট গবেষণার মাধ্যমেই বের করে থাকেন। এছাড়া উপরোক্ত হাবল'স আইনও এতে জড়িত। আমাদের নিকটস্থ বড় একটি গ্যালাক্সির নাম 'আনড্রমেডা'। পরীক্ষা করে দেখা গেছে এই পুরো তারাসিস্টেমটি দ্রুত আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির দিকে ৫০ কিমি/সে বেগে ধেয়ে আসছে। রেড-শিফটের মাধ্যমে জগতের সর্বাপেক্ষা পুরাতন বস্তু "ক্যুয়াইজার" সম্পর্কেও অনেক তথ্য জানা গেছে। এগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী ক'টির রেড-শিফ্‌ট ৫.০ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। যার অর্থ, এগুলোর দূরত্ব অন্তত ৩০০০ থেকে ৬০০০ হাজার মেগাপার্সেক! এগুলো থেকে আলোকরশ্মি পৃথিবীতে পৌঁছুতে ৯ থেকে ১৯ বিলিয়ন বছর সময় লাগে। অনেকের ধারণা ক্যুয়াইজারগুলো মূলত একেকটি বিরাক আকারের ব্ল্যাক হোল। যা হোক, হাবল'স আইন ও রেড-শিফ্‌ট থেকেই বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বের বয়স ১৪ বিলিয়ন বছর বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে এটা নিশ্চিত নয়। নিচে একটি ক্যুয়াইজি-স্টেলার-রেডিও-অবজেক্ট (ক্যুয়াইজার) এর চিত্র তুলে ধরা হলো।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

এনার্জি ও ব্যবহারিক গণিত

পূর্ববর্তী অধ্যায়সমূহে আমার এনার্জি শব্দটি একাধিকবার ব্যবহার করেছি। শব্দটি ছোট্ট কিন্তু এর অর্থ ব্যাপক- বলা যায় এটা পুরো বিশ্বব্যাপী ব্যাপ্ত। বাস্তবে এনার্জি দ্বারাই এই মহাবিশ্ব চলমান আছে। এনার্জি স্থির ও গতিশীল এই উভয় অবস্থায় অস্তিত্বশীল সব বস্তুর মধ্যে বিদ্যমান। এনার্জির মাধ্যমে কাজ সংঘটিত হয়। এনার্জির একটি সংজ্ঞা হলো: **"বস্তু দ্বারা কর্ম সম্পাদনের যোগ্যতা"**। কর্মকে ইংরেজিতে ওয়ার্ক (Work) বলে। আমরা এই অধ্যায়ে এনার্জির উপর বিস্তারিত আলোচনা করবো এবং কিভাবে গাণিতিকভাবে এনার্জির মাত্রা বের করা যায় সে সম্পর্কে তথ্যাদি তুলে ধরবো।

৮.১ সম্ভাব্য ও গতিশীলতার এনার্জি (Potential & Kinetic Energy)

সম্ভাব্য এনার্জিকে আমার বস্তুর মধ্যে জমা থাকা শক্তি হিসাবে আখ্যায়িত করতে পারি। দৃষ্টান্ত হলো, দড়ি দ্বারা ঝুলন্ত একটি ইটখণ্ড। যদিও ইটখণ্ডটি স্থির, তথাপি তার মধ্যে জমা আছে মহাকর্ষজণিত ফোর্স।
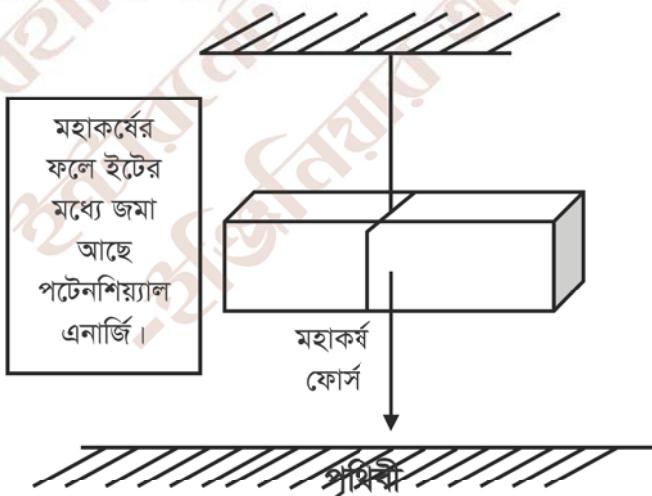
পটেনশিয়াল এনার্জি অন্যান্য সিস্টেমে জমা থাকতে পারে। দৃষ্টান্ত হিসাবে টানানো স্প্রিং ও রাবারের কথা বলা যেতে পারে। এছাড়া নদীর মধ্যে বাধ থাকলে যেদিকে পানি ফুলে ওঠে সেই পানিতেও সম্ভাব্য এনার্জি সৃষ্টি হবে। বস্তুর অভ্যন্তরেও পটেনশিয়াল এনার্জি থাকে। যেমন একটি এটমের কেন্দ্রে পটেনশিয়াল এনার্জি আছে। আনবিক চুল্লির মাধ্যমে এই এনার্জি রিলিজ করা যায়। ইলেকট্রিক চার্জ সম্পর্কে আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি। চার্জড্ বস্তুতেও সম্ভাব্য এনার্জি বিদ্যমান। অনুরূপ বোমা তৈরীর বিস্ফোরকের মধ্যেও বিরাট অঙ্কের পটেনশিয়াল এনার্জি জমা থাকে। বিস্ফোরণ ঘটলেই তা রূপান্তর হয়ে (কিনেটিক এনার্জি হিসাবে) আত্মপ্রকাশ করে।
মহাকর্ষজণিত পটেনশিয়াল এনার্জির মাত্রা নিম্নলিখিত সমীকরণ থেকে বের করা যায়:

$$E_p = mgh \text{ ---1}$$

এখানে E_p অর্থ পটেনশিয়াল এনার্জি, m হলো বস্তুর ম্যাস (ওজন), g হলো মহাকর্ষের কন্সটেন্ট যার মান হলো ৯.৮১ মি/সে.সে এবং h হলো মাটি থেকে বস্তুর উচ্চতা।

দ্বিতীয় জাতের এনার্জিকে বলে কিনেটিক এনার্জি। এই এনার্জি সর্বদাই বস্তুর গতির সঙ্গে সম্পৃক্ত। এই এনার্জির মাত্রা বস্তুর গতি ও ম্যাসের উপর নির্ভরশীল। এটা নিম্নের সমীকরণ থেকে হিসাব করা যায়:

$$E_k = 1/2(mv^2) \text{ ---2}$$

এখানে E_k হলো কিনেটিক এনার্জি, m হলো ম্যাস, v হলে বস্তুর গতি। নিম্নের দ্বিতীয় সমীকরণ দ্বারাও এনার্জির মাত্রা বের করা যায়।

$$E_k = (ma)d \text{ ---3}$$

এখানে a হলো ম্যাস m এর মধ্যে দেওয়া ত্বরণ এবং d হলো যে দূরত্বে a ক্রিয়া করে। আমরা এই তিনটি সমীকরণ দ্বারা বস্তুর মধ্যে সৃষ্ট পটেনশিয়াল ও কিনেটিক এনার্জির মান বের করতে পারি।

উপরোক্ত সমীকরণ ১, ২ ও ৩ ছাড়াও এনার্জির সাথে সম্পর্কিত আরো দু'টি সমীকরণ সম্পর্কে আমাদেরকে জানতে হবে। এগুলো হলো:

$$P \text{ (mechanical)} = \text{work done / time ---4}$$
$$P \text{ (electrical)} = IV \text{ ----5}$$

উক্ত সমীকরণদ্বয়ে P হলো ক্ষমতা বা পাওয়ার। I হলো কারেন্ট এবং V হলো ভলটেজ। এই সমীকরণদ্বয় এনার্জির সঙ্গে সম্পৃক্ত এজন্য যে, এনার্জি হলো "**কেপাসিটি টু ডু ওয়ার্ক**"। জানা থাকা দরকার পাওয়ার (P) ওয়াট (Watt) ইউনিটে মাপা হয়।

কোনো মেশিনে কতটুকু এনার্জি ঢুকানো হলো আর কতটুকু বেরিয়ে আসলো তার একটা হিসাব ঐ মেশিনের কর্মদক্ষতার একটি ধারণা দেয়। আমরা এই হিসাবটি নিম্নের সমীকরণ দ্বারা (%) বের করতে পারি:

$$\text{Efficiency} = (\text{work out} / \text{work in}) \times 100 \text{ ---6}$$

আপাতত এই ৬টি সমীকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে আমারা এনার্জি সম্পর্কিত বেশ কিছু হিসাব-নিকাশ করতে পারি। তবে এরপরও আরেকটি সমীকরণ এখানে লিপিবদ্ধ করে রাখছি। এই সমীকরণটি বস্তুর পারমাণবিক পর্যায়ে কার্যকরী এবং এটার প্রবর্তক রিলেটিভিটি থিওরীর প্রতিষ্ঠাতা আলবার্ট আইনস্টাইন। তিনি দেখিয়েছেন পারমাণবিক স্কেলে বস্তু ও এনার্জি মূলত একই জিনিস। বস্তুর মধ্যে যে পটেনশিয়াল এনার্জি বিদ্যমান তা বিরাট:

$$E = mc^2$$

এখনে E হলো এনার্জি, m মানে ম্যাস (বস্তুর পরিমান) ও c হলো আলোকের গতি (যা ৩০০,০০০ কিমি/সেকেন্ড)। লক্ষ করার ব্যাপার যে আলোকের গতিকে এখানে স্কোয়ার করা হয়েছে। এই সমীকরণ থেকেই আনবিক শক্তির উদ্ভাবন হয়েছিল। সামান্য ওজনবিশিষ্ট কিছু পদার্থ আছে (যেমন ইউরেনিয়াম) যার মধ্যে লুকানো থাকে বিরাট অঙ্কের এনার্জি। তবে অণুর কেন্দ্র থেকে এই এনার্জি বের করা তেমন সহজ ব্যাপার নয়। আনবিক চুল্লির মাধ্যমে তা করা হয়।
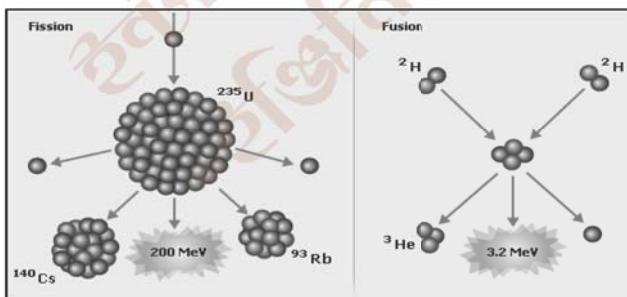
দুই ধরনের আনবিক প্রতিক্রিয়া: ফিশন প্রতিক্রিয়া দ্বারা বড় আনবিক কেন্দ্রকে ভেঙ্গে দেওয়া হয়। এতে রিলিজ হয় মোটা অঙ্কের এনার্জি। ফিউশন রিয়েকশনের মাধ্যমে দু'টি ছোট্ট কেন্দ্রকে একত্রিত করা হয়। এতেও বিরাট অঙ্কের এনার্জি নির্গত হয়।

নবম অধ্যায়

সমীকরণ

এ বইয়ে আমরা যে বিষয়ের উপর আলোচনা করছি তা মূলত সমীকরণের উপর নির্ভরশীল। ব্যবহারিত গণিতের অর্থই হলো অঙ্কে ব্যবহৃত বিভন্ন সমীকরণকে ডিজাইন, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অন্যান্য প্রাকটিকেল ক্ষেত্রে কাজে লাগানো। আমার বিভিন্ন অধ্যায়ে বেশ কিছু স্ট্যান্ডার্ড সমীকরণের ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করেছি। বর্তমান অধ্যায়ে সমীকরণ কী, কিভাবে এগুলো ডেভোলাপ করে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে।

৯.১ সংজ্ঞা

সমীকরণকে ইংরেজিতে “Equation" বলে। অঙ্কে আমরা বিভিন্ন সংখ্যা ও অজানা সংখ্যাকে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক বুঝাতে লিখিত ফর্মুলা তৈরী করি। এরূপ দু'টি অভিব্যক্তির মধ্যে সম্পর্কে সমান মান বুঝানোই হলো ইক্যুয়েশন। অর্থাৎ সমীকরণ মানেই হলো সমান চিহ্নের (=) উভয়দিক সমান। এটা মূলত গণিতের শাখা ‘বীজগণিতের’ সমীকরণ। সমীকরণ বিজ্ঞানজগতের প্রতিটি ক্ষেত্রে সর্বত্র ব্যবহৃত হয়। বিশুদ্ধ ও ব্যবহারিক এই উভয় বিজ্ঞানে সমীকরণ হলো তাদের মেরুদণ্ড। সমীকরণ ছাড়া পুরো বিজ্ঞানই অচল। প্রত্যেক সমীকরণে এক বা ততোধিক অজানা রাশি থাকে। এগুলোকে সাধারণত “ভেরিয়েবুল” (Variable) বা পরিবর্তনশীল রাশি বলে। সুতরাং আমরা বলেত পারি: **“যেসব গাণিতিক স্টেটমেনেন্টে (বা বাক্যে) সমান চিহ্ন থাকে এবং এর উভয় দিকের ফর্মুলা গাণিতিকভাবে লিখা থাকে তাকেই বলে সমীকরণ”**।

৯.২ বিভিন্ন ধরনের সমীকরণ

সমীকরণের দৃষ্টান্ত: $x^2 + x - 4 = 8$, $y = \sin x + x$, এবং $3y = \log x$.। আমরা প্রথম সমীকরণে যা বলছি: x একটি অজানা রাশি, একে স্কোয়ার (নিজে নিজে পূরণ) করে আরো একটি x যোগ দিলে এবং ৪ বিয়োগ করলে ফল দাঁড়াবে ৮। সুতরাং x এমন একটি সংখ্যা যা সমীকরণের বায়ে বসালে ফলাফল ৮ হতেই হবে। একইভবে অপর দু'টি সমীকরণ দ্বারাও আমরা বুঝাতে চাচ্ছি যে, বায়ের মান সমান ডানের মান। যে কোনো সমীকরণকে বলা যায় ‘সত্য’ বা ‘গ্রহণযোগ্য’ যদি তার উভয়দিকে অজানা

ভেরিয়েবুল বসালে উভয় দিকের মান সমান থাকে। আরেকটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টি আরো পরিষ্কার হবে।

$$2x + 5 = 13$$

উপরের সমীকরণে যখন x = 8 হবে একমাত্র তখনই সমীকরণ সত্য হবে। অন্য কোনো রাশি দ্বারা এই সমীকরণ গ্রহণযোগ্য হবে না। কিন্তু সমীকরণ এভাবে রাশি দ্বারা সেটিসফাইড না হলেও অসত্য হয় না। যেমন: $3x + 4y = 8$। এই সমীকরণে যদি আমরা x = ১ এবং y = ৩ ধরি তাহলে সমীকরণ সেটিসফাইড হবে না, কিন্তু তাই বলে এটা বাতিল নয়- বরং এটাকে বলা যায়, **"কন্ডিশন্যাল ইকুয়েশন"** (Conditional equation)।

আমরা কিছু কিছু ক্ষেত্রে সমীকরণ গড়ে তুলি যার ডানদিকের ফলাফল ভেরিয়েবুলের যে কোনো রাশির ক্ষেত্রে সমান। অর্থাৎ রাশির মান যা-ই হোক রেজাল্ট সর্বদাই একই- আর এই ফলাফল আমরা সমীকরণের ডানদিকে দেখিয়ে দিই। দৃষ্টান্ত থেকে কথাগুলো বুঝা যাবে:

$$(x + y)^2 = x^2 + 2xy + y^2$$

এই সমীকরণের উভয়দিক সর্বদাই সমান থাকবে আমরা x এবং y এর ভেল্যু যেটাই নিই না কেন। এক দু'টো সংখ্যা নিয়ে দেখি তাহলে: $x = 3, y = 4; (3+4)^2 = 3\times3 + 2\times3\times4 + 4\times4 = 7^2 = 9 + 24 + 16 = 49 = 49$ (উভয়দিকেই সমান ফলাফল)। এখন আমরা একই সমীকরণে x এবং y এর জন্য ভিন্ন সংখ্যা নেবো। $x = 5, y = 3; (5+3)^2 = 5\times5 + 2\times5\times3 + 3\times3 = 8^2 = 25 + 30 + 9 = 64 = 64$ (এ ক্ষেত্রেও উভয়দিকের ফলাফল সমান)। এরূপ সমীকরণকে বলে **"আইডেনটিটি"** (Identity)। এর অর্থ সমান চিহ্নের উভয়দিক সর্বদাই সমান। এরূপ অপর একটি দৃষ্টান্ত হলো: $\sin^2x + \cos^2x = 1$। এখানে x এর মান যেটাই হোক না কেন সর্বদাই বায়ের দিকের ফলাফল ১ হবে। মনে করুন x = ৩০ ডিগ্রী। সুতরাং $\sin^2 30 + \cos^2 30 = 0.25 + 0.75 = 1$; মনে করুন x = ৬০ ডিগ্রী। সুতরাং $\sin^2 60 + \cos^2 60 = 0.75 + 0.25 = 1$; অন্য সংখ্যা দ্বারা পরীক্ষা করে দেখুন। সর্বদাই রেজাল্ট হবে ১। আইডেনটিটি হলো ওসব সমীকরণ যাদের ফলাফল সকল অজানা রশির ক্ষেত্রেই সমান।

আরেক ধরনের সমীকরণ আছে যাকে বলা হয় "পলিনমিয়েল" (Polinomial)। এগুলো মূলত এরূপ:

$$a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \ldots + a_{n-2}x^2 + a_{n-1}x + a_n = 0$$

$a_0, a_1, a_2, a_{n-2}, a_{n-1}$ এবং a_n হলো কোএফিশিয়েন্ট (coefficients)। এগুলো মূলত কন্সটেন্ট (অপরিবর্তনশীল)। জানা থাকা দরকার যে, a_0 = ০ হবে না এবং n সর্বদাই পজিটিভ ইন্টেজার (আস্ত রাশি) হবে। n এর সর্বোচ্চ মানকে বলে "সমীকরণের ডিগ্রী"। এসব কথা আরো পরিষ্কার হবে এক দু'টো দৃষ্টান্ত দ্বারা।

১. $ax + b = 0$ ------- প্রথম ডিগ্রী পলিনমিয়েল, যাকে বলে **লিনিয়ার (Linear) পলিনমিয়েল**।

২. $ax^2 + bx + c = 0$ ------- দ্বিতীয় ডিগ্রী পলিনমিয়েল, যাকে বলে **কুয়াডরেটিক (quadratic)** পলিনমিয়েল।

৩. $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ ------- তৃতীয় ডিগ্রী পলিনমিয়েল, যাকে বলে **কিউবিক (cubic)** পলিনমিয়েল।

অন্যান্য সমীকরণ যেমন, আলজেবরিক ($2x = 4$), ত্রিকোণমিতিক বা ট্রিগোনোমেট্রিক ($\sin x + \cos 2x = y$), লগেরিথমিক ($\log x + 2 \log (x + 1) = 8$) এবং এক্সপোনেনশিয়েল ($3x + 2x - 5 = 0$) এখনে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া আছে উচ্চ পর্যায়ের গণিতে ব্যবহৃত "ডিফারেন্সিয়্যাল ইকুয়েশন" (Differential equation), যা এখানে উল্লেখ করাই যথেষ্ট।

৯.৩ সমীকরণে ব্যবহৃত π, এবং e

উপরোক্ত দু'টি সংকেত আমাদেরকে প্রায়ই বিভিন্ন সমীকরণে ব্যবহার করতে হয়। ব্যবহারিক গণিতেও এর ব্যবহার দেখা যায় যেমন, কোনো বৃত্তের ক্ষেত্রফল বের করতে হলে π এর প্রয়োজন পড়ে। এ দু'টি সংকেত আসলে কী?

উভয় সংকেতই আসলে একেকটি অপরিবর্তনশীল সংখ্যা। কিন্তু এসব সংখ্যা বিশেষ ধরনের। আমরা প্রথমে π নিয়ে আলোচনা করবো।

কোনো বৃত্তের পরিধির মাপকে (circumference) তার ব্যস (diameter) দ্বারা ভাগ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় সেটাই হলো π (পাই)। পাইকে বলা হয় ইউনিভার্সাল কন্সটেন্ট (Universal constant) বা বিশ্বজনীন অপরিবর্তনশীল রাশি। এর অর্থ হলো, পাই এর মান কখনো বেশকম হয় না। যে কোনো বৃত্তের ক্ষেত্রে পাই সমান থাকে। তবে এটা একটি ইরেশন্যাল নাম্বার (irrational number) বা ভগ্ন সংখ্যা। এর অর্থ হলো, এর দশমিক বিন্দুর পরে সংখ্যার শেষ নেই- অনন্ত পর্যন্ত চলমান। আটটি দশমিক বিন্দু পর্যন্ত π -এর মান হলো: **৩.১৪১৫৯২৬৫**। বৃত্তের ক্ষেত্রফল ছাড়াও অন্যান্য কিছু গাণিতিক সমীকরণে পাই ব্যবহার করতে হয়- দৃষ্টান্ত হলো গোলক ও সিলিন্ডারের ঘনফল। গোলকের ভলিউম $= 4\pi r^3/3$ এবং সিলিন্ডারের ঘনফল $= \pi r^2 h$।

গণিতে e-এর গুরুত্বও পাই থেকে কোনো ক্রমেই খাটো নয়। এটার সংজ্ঞা হলো: **গাণিতিক অভিব্যক্তি (expression) $(1 + 1/n)^n$ এর লিমিট যখন n-এর মান অতি বড় হতে হতে অসীম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে**। কথাটি পরিষ্কার হবে আমরা যদি n-এর জন্য কিছু সংখ্যা উক্ত এক্সপ্রেশনে ব্যবহার করে ফলাফল বের করি।

n-এর মান	$(1 + 1/n)^n$	ফলাফল
১	$(১+১/১)^{১}$	২.০০০
২	$(১+১/২)^{২}$	২.২৫০
৩	$(১+১/৩)^{৩}$	২.৩৬৯
৫	$(১+১/৫)^{৫}$	২.৪৮৯
১০	$(১+১/১০)^{১০}$	২.৫৯৪
২০	$(১+১/২০)^{২০}$	২.৬৫৩
১০০	$(১+১/১০০)^{১০০}$	২.৭০৫
১০০০	$(১+১/১০০০)^{১০০০}$	২.৭১৭
১০,০০০	$(১+১/১০,০০০)^{১০,০০০}$	২.৭১৮
α (অসীম)	....	২.৭১৮২৮...

সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে উক্ত এক্সপ্রেশনের মান ধীরে ধীরে এর লিমিটের দিকে যাচ্ছে। খুব বড় সংখ্যা নিয়ে দেখা গেছে e-এর লিমিটিং মান হলো ২.৭১৮২৮১৮২৮৫ এর কাছাকাছি। সুতরাং গণিতে আমরা এই e-এর জন্য এই সংখ্যাটি ব্যবহার করতে পারি। বরং সাধারণত ২.৭২ ব্যবহার করাই যথেষ্ট। গণিতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই e দেখতে পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীদের যারা উচ্চ গণিতের উপর অধ্যয়ন করছেন বা করবেন তারা অবশ্য এ সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন বা হবেন। এখানে উল্লেখের কারণ হলো, ব্যবহারিক গণিতেও এটা সময় সময় আত্মপ্রকাশ করে।

৯.৪ সূচক আইন (Rules of indices)

যে কোনো রাশির পওয়ারকে তার ইনডেক্স (index) বলে। যেমন x^3, এখানে ৩ হলো x-এর পাওয়ার বা ইনডেক্স। আমরা বাংলা শব্দ 'সূচক' ব্যবহার করবো না। ইনডেক্স শব্দের বহুবচনকে বলে ইন্ডিসেস। আমরা যখন এরূপ পাওয়ার নিয়ে অঙ্ক কষি তখন কিছু মৌলিক আইন অনুসরণ করতে হয়। এসব আইনকেই রুলস অব ইনডিসেস বা এক্সপোনেন্ট আইন বলে। নিম্নে এসব আইন লিপিবদ্ধ করা হলো।

১. $x^m \times x^n = x^{m+n}$; দৃষ্টান্ত : ৫২ × ৫৩ = ২৫ × ১২৫ = ৩১২৫ = $৫^{৩+২} = ৫^৫$।

২. $x^m \times y^m = (xy)^m$; দৃষ্টান্ত : $২^৩ \times ৩^৩$ = ৮ × ২৭ = ২১৬ = $(২ \times ৩)^৩ = ৬^৩$

৩. $(x^m)^n = x^{m\times n}$; দৃষ্টান্ত : $(২^২)^৩ = ২^{২\times৩} = ২^৬$

পাওয়ার বা এক্সপোনেন্ট পজিটিভ কিংবা নেগিটিভ আস্ত সংখ্যা হতে পারে। এছাড়াও এগুলো রেশন্যাল এবং ইরেশন্যাল কিংবা কমপ্লেক্স সংখ্যাও হতে পারে। মনে রাখা দরকার যে:

$$X^{-n} = 1/ X^n ; X^0 = 1 \text{ এবং } X^1 = X$$

এক্সপোনেন্ট নেগিটিভ (অর্থাৎ মাইনাস সাইনসহ) হলে: + × + = +; − × − = +; + × − = − ; − / + = − এবং − / − = + এসব আইন মেনে কাজ করতে হবে।

৯.৫ রুটস্ (roots)

আমরা যখন কোনো সংখ্যাকে একাধিকবার গুণ করি তখন একটি ফলাফল পাই। যেমন ২×২×২ = ৮। আমরা সংখ্যা ৮ পেয়েছি ২-কে তিনবার গুণ করে। সুতরাং ২-কে বলা হয় ৮-এর তৃতীয় রুট। অনুরূপ ৪-কে তিনবার গুণ করলে ফল দাঁড়ায় ৬৪। সুতরাং ৪-কে বলা হয় ৬৪-এর তৃতীয় রুট। ৫×৫=২৫ সুতরাং ৫ হলো ২৫-এর দ্বিতীয় রুট। গণিতে রুটসকে লেখা হয় এভাবে: $\sqrt[২]{২৫}$; $\sqrt[৩]{৬৪}$ ইত্যাদি। উপরের ছোট্ট সংখ্যা দ্বারা দ্বিতীয়, তৃতীয় ইত্যাদি রুট বুঝাচ্ছে। জানা থাকা দরকার যে, দ্বিতীয় রুটকে বলে স্কোয়ার রুট, তৃতীয়কে কিউব রুট। স্কোয়ার রুট লিখতে সংখ্যা ২ লিখার প্রয়োজন হয় না, এটা যে স্কোয়ার রুট তা এমনিতেই বুঝতে হবে। $\sqrt{২০}$ অর্থ হলো ২০ এর স্কোয়ার রুট। গণিতে রুটসকে অন্যভাবেও লিখা যায় যেমন:

$১৬^{১/২}$, $২৫^{১/২}$, $৮^{১/৩}$, $১৬^{১/৪}$ ইত্যাদি।

রুটস নিয়ে হিসাব-নিকাশ করার জন্য কয়েকটি বিশেষ আইন মেনে চলতে হয়। এই আইনগুলোকে বলে "রেডিকেলের আইন" (laws of radicals)। নিম্নে এগুলো ব্যাখ্যা তুলে ধরা হলো।

1. $\sqrt[n]{ab} = \sqrt[n]{a} \times \sqrt[n]{b}$

Ex. $\sqrt[3]{8} \times \sqrt[3]{27} = \sqrt[3]{8\times 27} = \sqrt[3]{216} = 6$

2. $\frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}}$

Ex. $\frac{\sqrt[3]{8}}{\sqrt[3]{27}} = \sqrt[3]{\frac{8}{27}} = \frac{2}{3}$

3. $(\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$

Ex. $(\sqrt[3]{8})^2 = \sqrt[3]{8^2} = 4$

4. $\sqrt[nm]{a^{nk}} = \sqrt[m]{a^k}$

Ex. $\sqrt[3\times 2]{8^{3\times 4}} = \sqrt[2]{8^4}$

$= \sqrt[2]{4096} = 64$

5. $\sqrt[m]{\sqrt[n]{a}} = \sqrt[mn]{a}$

Ex. $\sqrt[2]{\sqrt[3]{64}} = \sqrt[2\times 3]{64}$

$= \sqrt[6]{64} = 2$

রেডিকেলের ৫ আইন

৯.৭ সমীকরণ রূপান্তর

যে কোনো সমীকরণকে সুবিধার জন্য আমাদেরকে প্রায়ই ভিন্নভাবে লিখতে হয়। যে অজানা সংখ্যাটি বের করতে হবে তাকে সমীকরণের বায়ে এনে বাকী সবকিছু ডানে লিখলে অঙ্ক কষা অনেকটা সহজ হয়ে দাঁড়ায়। এভাবে রদবদলকেই বলে সমীকরণ রূপান্তর (transforming equations)।

সমীকরণ রূপান্তরের কিছু আইন আছে। এগুলো শিখে নিলে অতি সহজেই যে কোনো সমীকরণ প্রয়োজনমাফিক রূপান্তর করা যেতে পারে। প্রথমেই আমাদেরকে মনে রাখা দরকার যে, **"যাকিছু সমীকরণের বায়ের দিকে করবো ঠিক তা-ই ডানের দিকেও করতে হবে"**। এই মৌলিক আইনটি মনে রেখে আমরা অন্যান্য আইন বা উপায়-উপকরণ ব্যবহার করে আমাদের কাঙ্ক্ষিত রূপান্ত করতে পারি।

আইন ১: ক্রস-মাল্টিপ্লিকেশন (cross multiplication) এবং ভাগ বা আড়াআড়ি পূরণ। নিম্নের সমীকরণকে এই আইনের মাধ্যমে রূপান্ত করা হয়েছে।

$$c/h = i/y$$

উক্ত সমীকরণকে রূপান্তর করে h সমান কী হবে তা বের করতে হবে। আমাদেরকে এমন কিছু কাজ করতে হবে যার ফলে = চিহ্নের বায়ে শুধুমাত্র h থাকবে। ক্রস-মাল্টিপ্লিকেশন অর্থ হলো এক সাইডের উপরের ভেলুর সঙ্গে অপর সাইডের নিচের ভেলু দ্বারা পূরণ করা। সুতরাং উপরের সমীকরণ ক্রস-মাল্টিপ্লিকেশ পরে এভাবে লিখতে হবে:

$$i \times h = c \times y \text{ ---১}$$

এবার আমাদেরকে বায়ের i-কে সরাতে হবে। আমরা মৌলিক আইন তথা উভয় দিকে একই কার্য করার নিয়মকে ব্যবহার করতে পারি। সুতরাং i-কে i দ্বারা ভাগ করে নেবো। অর্থাৎ:

$$i \times h/i = c \times y/i$$
$$h = cy/i \text{ --২}$$

লক্ষ করুন বায়ের দিকে i কেনসেল হয়ে গেছে কিন্তু ডানে তা রয়ে গেছে। সুতরাং এভাবে আমরা সমীকরণ ১-কে রূপান্তর করে কাঙ্ক্ষিত সমীকরণ ২-এ উপনীত হলাম।

আইন ২: এক দিক থেকে অপর দিকে নেওয়া। আমরা যে কোনো সমীকরণের এক সাইডের সংখ্যা বা অজানা রাশিকে অপর সাইডে নিয়ে যেতে পারি। তবে মনে রাখা দরকার, "**কোনো রাশিকে এক সাইড থেকে অপর সাইডে নিলে তার সাইন (+ বা -) পরিবর্তন করতে হবে**"। এটাও একটা মৌলিক আইন। নিচের দৃষ্টান্ত থেকে বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

$$R + 9 - T = W + 8 \text{ ---৩}$$

এই সমীকরণকে রূপান্তর করে T সমান কী তা বের করতে হবে। আমরা প্রথমে আইন ২ মুতাবিক শুধু T-কে বায়ে রেখে বাকী সবকিছু = চিহ্নের ডানে নিয়ে যাবো। অবশ্য সাইন বদলের মৌলিক আইন ভুলবো না।

$$-T = W - R + 8 - 9$$
$$-T = W - R - 1$$

এঃ এর পূর্বের − সাইনকে বদলানোর রাস্তা হলো প্রতিটি টার্মকে −১ দ্বারা পূরণ করা। কারণ আমরা জানি − × − = + আর + × − = −। সুতরাং উপরোক্ত সমীকরণ −১ দ্বারা পূরণ করার পরে হবে:

$$T = R - W + 1 \text{ (R-কে আগে লিখেছি) --- ৪}$$

এবার একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। তাপমাত্রা এক স্কেল থেকে আরেক স্কেলে রূপান্তরের একটি সমীকরণ হলো:

$$\mathbf{C = (F - 32) \times 10/18 \text{ ....1}}$$

এখানে **C** হলো সেন্টিগ্রেড স্কেলে তাপমাত্রা আর **F** হলো ফারেনহাইট স্কেলে তাপমাত্রা। এখন আমাদেরকে যদি **F** সমান কি হবে তা বের করতে হয় তাহলে সমীকরণ ১-কে রূপান্তর করতে হবে। নিম্নে এই পদ্ধতি দেখানো হলো।

$$C = (10F - 32 \times 10) / 18$$
$$C = 10F/18 - 320/18$$

$$C = 5F/9 - 160/9$$

$C9 = 5F - 160$ --- (এখানে ৯ দ্বারা প্রতিটি টার্মকে পূরণ করেছি)

$$C9 + 160 = 5F \text{ or}$$

$$5F = 9C + 160$$

$F = 9/5C + 32$ (এখানে ৫ দ্বারা প্রতিটি টার্মকে ভাগ করেছি)। সমীকরণটিকে এভাবেই রাখা যায় তবে আরো কিছু সুন্দর করতে যেয়ে:

$$\mathbf{F = (C \times 18/10) + 32 \ldots 2}$$

(এখানে ৯/৫ -কে দ্বিগুণ করেছি)

উভয় সমীকরণই যে সমান তার প্রমাণ: মনে করুন $C = 10$, তাহলে সমীকরণ ১ থেকে:

$10 = (F - 32) \times 10/18$
$10 = 10F/18 - 320/18$
$10 + 320/18 = 10F/18$
$180 + 320 = 10F$ (multiplying every term with 18)
$500 = 10F$
$500/10 = F$ or
$F = 50$

সমীকরণ ২ থেকে:

$F = (10 \times 18/10) + 32$
$F = 18 + 32 = 50$

সমীকরণ ২ দ্বারা অতি সহজে সমাধান পেয়ে গেলাম। এ কারণেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমীকরণকে রূপান্তর করে নিলে কাজটা অতি সহজ হয়ে ওঠে।

আইন ৩: সাবস্টিটিউশন বা প্রতিকল্পনের মাধ্যমে রূপান্তর। অনেক সময় দেখা যায় আমাদেরকে দু'টি সমীকরণ দেওয়া হয়েছে। উভয়টি ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা

সমীকরণের সমাধান বের করতে পারি। এই উপায়কে বলে সাবস্টিটিউশন। দৃষ্টান্ত হিসাবে নিম্নের দু'টি যুগপৎ (simultaneous) সমীকরণের প্রতি লক্ষ্য করুন।

$$x + y = 6 \text{ এবং } x = 2y$$

দ্বিতীয় সমীকরণে যেহেতু x এর সমান দেওয়া হয়েছে তাই আমরা প্রথমটিতে এই মানকে নিয়ে বসাতে পারি:

$$2y + y = 6$$

এখন যেহেতু উপরোক্ত সমীকরণে একটি মাত্র অজানা রাশি আছে তাই এটি কী তা আমরা সহজে বের করে নিতে পারি:

$$3y = 6$$
$$y = 6/3 = 2$$

এবার যেহেতু আমরা y মান জেনে নিয়েছি তাই দ্বিতীয় সমীকরণে এটা সাবস্টিটিউট করলে x এর মান পেয়ে যাবো।

$$x = 2 \times 2 = 4$$

ব্যবহারিক গণিতে বিভিন্ন হিসাব-নিকাশের সময় সমীকরণকে পাল্টানো প্রায়ই জরুরী হয়ে দাঁড়ায়। এ কারণেই শিক্ষার্থীদেরকে রূপান্তর পদ্ধতি খুব পাকা করে শিখে নিতে হবে। নিম্নে আরো ক'টি দৃষ্টান্ত লিপিবদ্ধ করে এই অধ্যায়ের ইতি টানছি।

1. $F = ma$; $m = F/a$ and $a = F/m$

2. $Q^2 + 9T = 18 + V$; $Q = \sqrt{18 + V - 9T}$; $T = 9 + V/9 - Q^2/9$ and $V = Q^2 + 9T - 18$

3. $1/2(a+b) + T^3 = 99$; $T = \sqrt[3]{1/2(a+b)}$; $1/2a = -1/2b - T^3$; $a = - b - T^3 / 1/2 = - b - T^3/0.5$ and $b = - a - T^3/0.5$ (by inspection)

4. $a^2 + 2b^2 + 45 = 0$; $a = \sqrt{-2b^2 - 45}$; $b = \sqrt{(- a^2 - 45)/2}$

5. $K = 1/2mv^2$; $m = 2K/v^2$ and $v = \sqrt{2K/m}$
6. a = (v - u) / t ; t = (v - u) a; v = at + u and u = v - at

7. (7y + 4x) / 7 = 9x + 3; 7y + 4x = 67x + 21; 4x - 67x = 21 - 7y ; -63x = 21 - 7y; 63x = 7y - 21; x = 7(y - 3)/63 ; x = (y -3) / 9 and y = (63x + 21)/7 or y = 9x + 3

8. $E = mc^2$; $m = E/c^2$; $c = \sqrt{E/m}$

9. F = g(m1 + m2) ; g = F / (m1 + m2) ; m1 = (F - gm2) / g ; m2 = (F - gm1) / g

গাণিতিক সংকেত